বৈদিক অপশূদ্রের বিচারে দলিতচর্চা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল (মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র)
উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক: ড. মনোজিৎ মন্ডল
অধ্যাপক ইংরেজী বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা-৭০০০৩২

গবেষক: কৌশিক সরকার
মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষাবর্ষ- ২০১৭-২০১৯
ক্রমিক সংখ্যা- MPWO194014
রেজিস্ট্রেশন নং- ১১৪৫৬০ (২০১১-২০১২)

DECLARATION

I, Kaushik Sarkar (Class Roll no: 001730101014; Registration no: 114560 of 2011-12) do hereby declare that the dissertation entitled **"বৈদিক অপশূদ্রের বিচারে দলিতচর্চা"** has been prepared entirely by me under the guidance of Prof. Manojit Mandal, Department of English, Jadavpur University, Kolkata- 700032.

I hereby declare that this work is original and has not been submitted in part or full to any other University or Institutes for the award of any degree or diploma.

.....

(Candidate)

Kaushik Sarkar

School of Women's Studies

Jadavpur University

Kolkata- 700032

M.Phil in Women's Studies
Affiliated to the
Faculty of Interdisciplinary Studies, Law & Management
Jadavpur University
Kolkata, India

CERTIFICATE OF RECOMMENDATION

This is to certify that the thesis entitled "বৈদিক অপশূদ্রের বিচারে দলিতচর্চা" is bonafide work carried out by KAUSHIK SARKAR under our supervision and guidance for partial fulfilment of the requirement for M.Phil in Women's Studies during the academic session 2019.

(Supervisor)
Prof. Manojit Mandal
Department of English
Jadavpur University
Kolkata-700032

(Director)
Prof. Aishika Chakraborty
School of Women's Studies
Jadavpur University
Kolkata- 700032

(Dean)
Faculty of Interdisciplinary Studies,
Law & Management (ISLM)
Jadavpur University
Kolkata-700032

CERTIFICATE OF APPROVAL **

This foregoing thesis is hereby approved as a credible study of a social science/humanities subject carried out and presented in a manner satisfactorily to warranty its acceptance as a pre-requisite to the degree for which it has been submitted. It is understood that by this approval the undersigned do not endorse or approve any statement made or opinion expressed or conclusion drawn therein but approve the thesis only for purpose for which it has been submitted.

Committee

Final Examination for the evaluation of the thesis

** Only in case the thesis is approved.

মুখবন্ধ

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগভবেৎ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র বিভাগে এম.ফিল পাঠ্যক্রমে সুযোগ পেয়ে আমি **"বৈদিক অপশূদ্রের বিচারে দলিতচর্চা"** বিষয়টি আমার গবেষণার বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছি। এই গবেষণা পত্রে নিম্নবর্গীয় জাতিসমূহের বিবরণ ও নিম্নবর্গীয় বর্ণের মধ্যে বৈদিক যুগের সামাজিক সাংস্কৃতিক জাগরণের চেতনা রূপান্তরের প্রক্রিয়া ও প্রেক্ষিতকে তুলে ধরতে পেরেছি।

এই গবেষণা পত্রটি তত্ত্বধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক মনোজিৎ মন্ডল মহাশয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা, মূল্যবান উপদেশ, উৎসাহ দান এবং অন্যান্য সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণা পত্রটি সুসম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। সর্বোপরি তিনি আমায় মানসিক উৎসাহ সঞ্চার করেছেন, যা আমার গবেষণার কাজকে সহজ করে তুলেছে। তার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

এরপরে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই ড. হার্দিক ব্রত বিশ্বাস (সহকারী অধ্যাপক, মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) মহাশয়কে। তার মূল্যবান নির্দেশনা, পরামর্শ ও গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা তিনি আমার সমগ্র গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে আমাকে বিষেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন।

আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র ও সংস্কৃত বিভাগের সমস্ত অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা মন্ডলীদের এবং মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্রের গ্রন্থাগারিক মহাশয়াকে।

আলোচ্য গবেষণা পত্রটি পরিপূর্ণতা দানের জন্য যে সকল গ্রন্থাগারের সাহায্য পেয়েছি সেগুলি হল- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্রের গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত বিভাগীয় গ্রন্থাগার, গোলপার্ক

রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার, কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার- এই সকল সমস্ত গ্রন্থাগারের কর্মকর্তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

গবেষণা চলাকালীন যারা নানা তথ্য, মতামত ও আনুষঙ্গিক কাজে আমাকে সাহায্য করেছে চিন্ময় মিশ্র দা, অঞ্জন দাস দা, মনোজ কর্মকার দা, লিটন মল্লিক দা, পাভেল স্টালিন বর্মণ দা, মুরারী মোহন মিস্ত্রী দা, সুজয় সিংহ দা, শুভদীপ দাস দা, কৃষ্ণ কুমার সরকার দা, নন্দদুলাল মন্ডল, রাখহরি বাগ ও ভাস্বতী সাহা সহ আরও অনেকে। তাদের প্রতি আমার রইল শুভেচ্ছা ও প্রার্থনা।

সবিশেষ আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই পিতা শ্রী কার্তিক সরকার ও মাতা শ্রীমতী চন্দনা দাস (সরকার) এর কাছে, যারা আমার সর্ব কর্মের অনুপ্রেরণার উৎস, যাদের কাছে আমি চিরঋণে আবদ্ধ, তাই আমি আমার এই ক্ষুদ্র গবেষণা সন্দর্ভটিকে উৎসর্গ করি তাঁদের প্রতি।

এছাড়াও গবেষণা পত্রটি নির্মানে আমাকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার (Swami Vivekananda Merit-Cum-Means Scholarship Non-Net M.Phil) কর্তৃপক্ষের কাছে আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

মে, ২০১৯

কৌশিক সরকার
মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কোলকাতা- ৭০০০৩২

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
নামপত্র	i
ঘোষণাপত্র	ii
শংসাপত্র	iii-iv
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	v-vi
ভূমিকা	১-৩
প্রথম অধ্যায়	৪-১৩
দলিতের সংজ্ঞায়ন	
দ্বিতীয় অধ্যায়	১৪-২৫
অভিজাত বর্ণ বনাম দলিতদের পারস্পরিক সম্পর্ক	
তৃতীয় অধ্যায়	২৬-৩৬
বৈদিক ও বর্তমানের ভিত্তিতে দলিতচর্চা	
চতুর্থ অধ্যায়	৩৭-৭৮
প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের দর্পণে অপশূদ্র বনাম দলিত	
উপসংহার	৭৯-৮২
গ্রন্থপঞ্জী	৮৩-৮৬

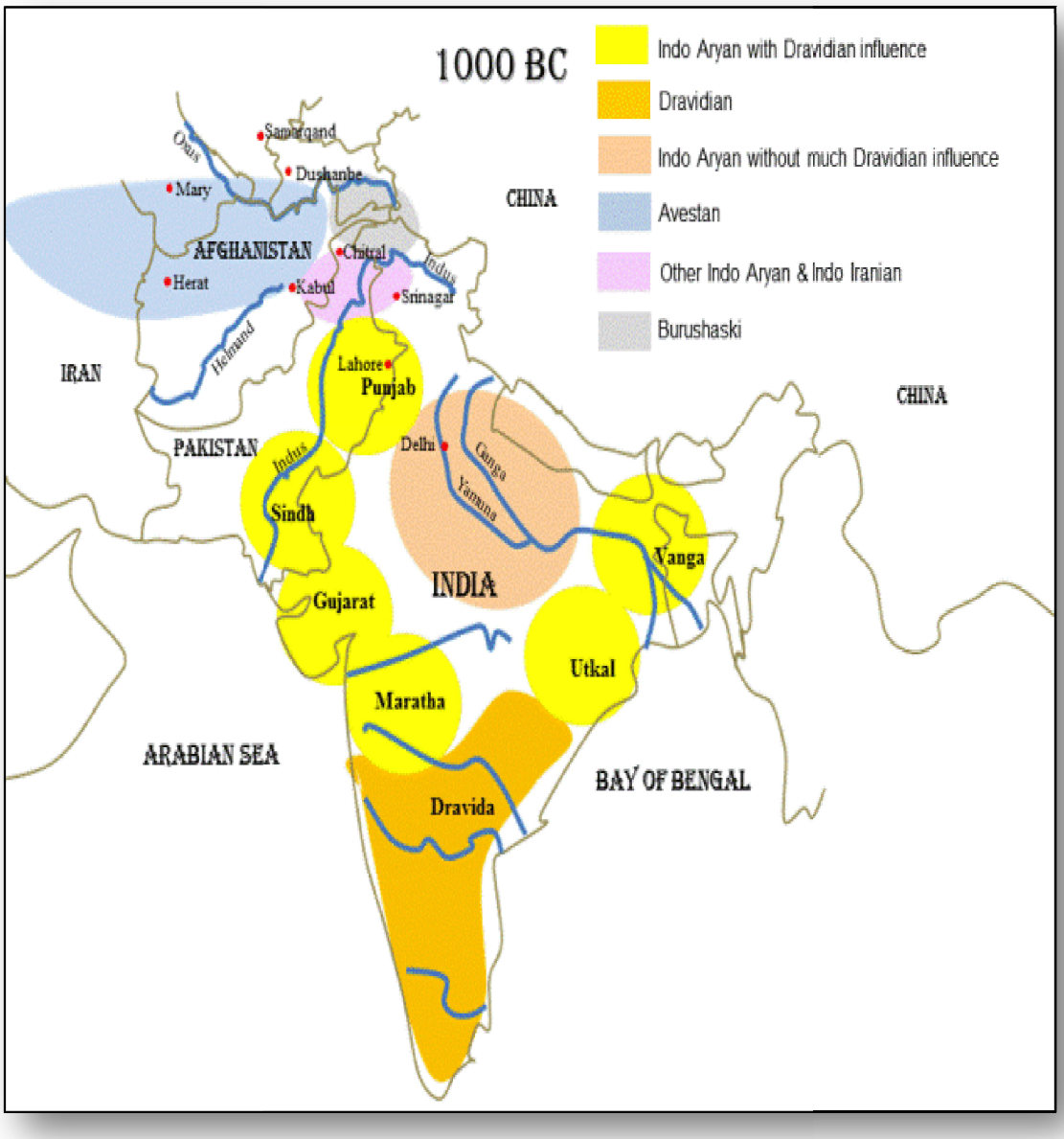

Fig.1: Indian Civilization: 1000 BCE to 1500 CE

https://www.google.com/search?q=1000+b.c+indian+map&rlz=1C1CHBD_enIN745IN745&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwignPqz15biAhVLVH0KHc8rCoEQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=W07kU7djru6nkM:

ভূমিকা

ভূমিকা

বিগত কয়েক দশক ধরে সমাজবিজ্ঞানী, সাংবাদিক মহলে এবং সাধারণ জনমানসে দলিতচর্চা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে চলেছে। কিন্তু দলিত বলতে ঠিক কী বোঝায়? এটা সম্ভবত লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে একটি মূল্যবান প্রশ্ন দলিত শব্দটি বুৎপত্তিগতভাবে 'দলন' শব্দটি থেকে এসেছে। স্ববিশেষ অর্থব্যঞ্জক দলিত শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তা নিম্নে উল্লেখিত হল:

বিভিন্ন মত ও অর্থে	দলিত কে বা কারা?
১. সংকীর্ণ অর্থে	হিন্দু চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার একেবারে নিম্নস্তরের শূদ্র এবং তারও বাইরের অতিশূদ্র ও অন্যান্য জনগণ।
২. বৃহৎ অর্থে	আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে শোষিত সমাজের প্রান্তিক নারী, শিশু, বৃদ্ধ, তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, সংখ্যালঘু, আদিবাসী প্রভৃতি জনগোষ্ঠী।
৩. ঐতিহাসিক অর্থে	অপবিত্র, ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল, অচ্ছ্যুত, অন্ত্যজ, হরিজন সম্প্রদায়।
৪. সাংবিধানিক অর্থে	তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের কিছু অংশ।
৫. আধুনিক অর্থে	দলিত 'পরিচিতি' প্রদানকারী শিক্ষিত চেতনা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী।
৬. আদমশুমারী অর্থে	ভারতের প্রায় ১৭ কোটি জনগণ।
৭. রাজনৈতিক অর্থে	নিম্নবর্গীয় আন্দোলন ও অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের আশায় নিহিত সচলায়িত গোষ্ঠী।
৮. অর্থনৈতিক দিক থেকে	পশ্চাৎ পদ ও দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী অধিকাংশ জনগণ।
৯. গান্ধিবাদী মতে	হরিজন সম্প্রদায়।
১১. মার্কসবাদী মতে	শ্রেণী সচেতন কৃষক, কৃষিশ্রমিক, দিনমজুর, ছাত্র এবং অন্যান্য সমপর্যায়ের পেশাগত গোষ্ঠী।

উপরি উক্ত তালিকা থেকে তাই সাধরণভাবে দলিত বলতে বোঝায় নিগৃহীত, নিষ্পেষিত ও সমাজিকভাবে নিপিড়ীত মানুষদের যারা জন্মগতভাবে জাতিপ্রথার নিম্নাংশে অবস্থান করে। বৈদিক যুগেও (১০০০-৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) আমরা জাতপাত নিয়ে আলোচনা দেখা যায়। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমরা চতুর্বর্ণের কথা জানতে পারি। চতুর্বর্ণ সম্পর্কে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে-

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।। (মনু সং. ১০/৪)

অর্থাৎ এই চতুর্বর্ণ হল- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই শূদ্ররাই ছিল সমাজের বড় জনগোষ্ঠীর অধিকারী, অথচ তাদেরই নিম্নবর্গের মানুষ বলে নিচের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। এই নিম্নবর্গের শূদ্র মানুষদের মধ্যে আবার অচ্ছুৎ হিসাবে দেখা হত দলিত সম্প্রদায়কে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভারতবর্ষে দলিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দু ধর্মকে সম্পৃক্ত করা হলেও একথা ভুলে যাওয়া উচিৎ হবে না যে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মেও জাতিপ্রথা তথা দলিত সম্প্রদায়ের অবস্থান লক্ষণীয়। বলাই বাহুল্য উল্লিখিত ধর্মগুলির মধ্যে হিন্দুধর্মই সর্বাধিক প্রাচীন। স্মৃতিশাস্ত্র হিসাবে খ্যাত মনুসংহিতায় দলিতদের মানবজাতির মধ্যে নিকৃষ্টতম জাতি বলা হয়েছে। দলিতদের অন্তজ ও অস্পৃশ্য বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।

বৈদিক যুগে দলিত শ্রেনির মানুষরা সামাজিকগত দিক দিয়ে বঞ্চিত হলেও তাদের মধ্যে লড়াই এর ক্ষমতা ছিল। সাধারণভাবে বেদ বলতে আমরা বুঝি- ১. ঋক্ ২. সাম ৩. যজু ও ৪. অথর্ব বেদকে। আবার বেদের উপাঙ্গ হিসাবে আমরা পাই- পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায় ও ধর্মশাস্ত্রকে। বেদের উপাঙ্গের মধ্যে মীমাংসা দর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঁচিশতম সূত্র থেকে আটত্রিশতম সূত্র পর্যন্ত যে অধিকরণ বর্ণনা করা হয়েছে তা হল ‘অপশূদ্রাধিকরণম্’। অপশূদ্রাধিকরণ হল– “অপগতঃ নিষ্ক্রান্তঃ বহিস্কৃতঃ শূদ্রঃ যস্মাৎ অথবা যত্র অধিকরণে তৎ অপশূদ্রাদিকরণম্”। যে অধিকরণে শূদ্রকে বহিষ্কার করা হয়েছে এমন অধিকরণ হল অপশূদ্রাধিকরণ।

এখন প্রশ্ন 'দলিত' শব্দটি কি সঠিক অর্থবহ? যদি তাই হয় তবে, শাস্ত্রীয় সাধারণ জনমানসের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য সকল বর্ণের জনগোষ্ঠীদের কি অভিজাত বলা উচিত? আসলে এর মধ্যে রয়েছে 'অভিজাত' বনাম 'অপশূদ্র' বা উচ্চবর্ণ জাতি বনাম নিম্নবর্ণের সংঘাত। সামাজিক ও অর্থনীতিগত অবদমন এক্ষেত্রে বেশি কাজ করে। মূলত প্রচুর নিম্নবর্গীয় সমাজ-সংস্কৃতির অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে এবং তাদের রক্ষা করা প্রয়োজন। নচেৎ বঞ্চিত হবে সমাজের সবচেয়ে বড় অংশ দলিত সম্প্রদায়।

গবেষণার উদ্দেশ্য :-

গবেষণা সমস্যাটিকে কেন্দ্র করে কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করা গবেষণার পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এই প্রশ্নগুলিকে বলা হয় গবেষণা প্রশ্ন। গবেষণা প্রশ্নের উদ্দেশ্য হবে অনুসন্ধানের বিষয়টি প্রশ্নের আকারে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা। এই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর প্রদাণের মাধ্যমে গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ সফল হবে।গবেষণার প্রশ্নগুলি হল নিম্নরূপ-

১। দলিত চর্চার ইতিহাস নিয়ে যে সব নানাবিধ ভাবনা চিন্তা গ্রহণ রয়েছে তার একটি সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া।

২। শূদ্র ও দলিত সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ককে পড়া এবং তৎসঙ্গে বর্তমানে বিপন্ন সম্প্রদায়ের আলোচনায় ও বিশ্লেষণে যে সব ভাবনা চিন্তা চলছে সে সম্পর্কেও ধারণা তৈরি করা।

৩। প্রচলিত ধারার সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা শূদ্র সম্প্রদায়ের ধারক ও বাহক দলিত চর্চার প্রয়োজন কোথায়, তা বোঝার চেষ্টা করা।

৪। আমাদের দেশে হারিয়ে যেতে বসা বিভিন্ন দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের নিজ অধিকার নিয়ে সংগ্রামের ক্ষমতা এবং তাদের অস্তিত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ।

প্রথম অধ্যায়

দলিতের সংজ্ঞায়ন

প্রথম অধ্যায়: দলিতের সংজ্ঞায়ন

'দলিত' শব্দটি এসেছে 'দলন' শব্দটি থেকে। 'দলন' বলতে আমরা যা বুঝি তা হল কাউকে গায়ের জোরে বা মানসিক দিক দিয়ে বশ মানিয়ে, উপরে উঠতে না দেওয়া বা বলপূর্বক কাউকে দমিয়ে রাখা। এই প্রকিয়ার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে নির্যাতন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যা প্রভৃতি সব কিছুই জড়িত। এই দলন ক্রিয়া সাধারণত ব্যক্তি মানুষের মধ্যে ঘটে চলেছে অহরহ-ই। এই দলন শব্দটি এক অর্থে নতুন-মারাঠি সাহিত্য থেকে নেওয়া।[১] রাজনীতিগত ভাবে বলতে গেলে ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি 'দলিত প্যান্থার' নামক সংগঠনের আত্মপ্রকাশের পর থেকেই একটি পরিভাষা হিসেবে শব্দটি জনপ্রিয় হয়েছে।[২]

প্রাচীন ভারতে মানুষ কর্তৃক মানুষের এই 'দলন'-প্রক্রিয়া যেহেতু প্রধানত গোষ্ঠীবদ্ধভাবেই সংগঠিত হয়েছে সেই কারনে 'দলনকারী' ও 'দলিত' সম্পর্কের বিভাজনটিও অনেকখানি গোষ্ঠীগত। ভারতে বর্ণভেদ-এর ক্ষেত্রে 'শ্রম-বিভাজন'-এর তত্ত্বকথা গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারী বর্ণভেদ চালু থাকলেও শেষপর্যন্ত তা জন্মসূত্রে জাতিভেদ প্রথায় পর্যবসিত। হিন্দু বর্ণব্যবস্থার নিরিখে 'দলিত' বলতে সাধারণভাবে সেইসব জাতি-গোষ্ঠীর মানুষদের বোঝায় যাদের অবস্থান 'চতুর্বর্ণ'-এর বাইরে। সে অর্থেই তারা 'অবর্ণ' বা 'অতিশূদ্র'। স্তর-বিন্যস্ত জাতি-ব্যবস্থায় তাই তারা অপবিত্র বা অস্পৃশ্য। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ঘনশ্যাম শাহ তাই লিখেছেন: Traditionally, in the Hindu social order, they are placed at the bottom of the hierarchy, considered Ati-Shudras or Avarna, and are treated as untouchables."[৩] সনাতনী সামাজিক বিভাজনের সূত্র ধরেই বর্তমানে প্রশাসনিক পরিভাষায় 'দলিত' বলতে আমরা সাধারণভাবেই তাদের বুঝি যাদের 'তপশিলিভুক্ত জাতি '(Scheduled Castes) হিসেবে গণ্য করা হয়। অনেকে অবশ্য 'তপশিলিভুক্ত উপজাতিসমূহ '(Scheduled Tribes) এবং 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীসমূহ' (Other Backward castes) কেও 'দলিত' অভিধায় ভূষিত করেন। প্রসঙ্গত একথা মনে রাখাটা খুবই জরুরি যে, সনাতনী বর্ণব্যবস্থা বা জাতিভেদ প্রথার নিরিখে 'দলিত' বলতে তথাকথিত

'অস্পৃশ্য' জনগোষ্ঠীগুলিকে বোঝানো হয়ে থাকে। আবার 'তপশিল'-ভুক্ত সব জাতি–গোষ্ঠীগুলিকেও ইতিহাসগতভাবে সম-মাত্রায় অস্পৃশ্যতার-র শিকার হতে হয়নি। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে- পৌন্ড্রক, ওড্র দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, শক, চীন, কিরাত, দরদ, খস- এরা সবাই নাকি ক্ষত্রিয়-মর্যাদা থেকে অধঃপতিত হয়ে বৃষল বা শূদ্রগোষ্ঠীতে স্থান পেয়েছে।

শনকৈশ্চ ক্রিয়ালোপদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণ্যাদর্শনেন চ। (মনু. ১০/৪৩)[৪]

অর্থাৎ বহিরাগত আর্যেতর জনগোষ্ঠীগুলিকেও বর্ণব্যবস্থার ছকে ফেলে আচারবিচারের মাপকাঠিতে মর্যাদা বা অমর্যাদায় চিহ্নিত করা হচ্ছে! আর আর্যভাষী বা ম্লেচ্ছভাষী যেসব লোকজন বাইরে থেকে গেল তাদের পরিচয় দস্যু হিসেবে।

যা লোকে জাতয়ো বহিঃ/ ম্লেচ্ছবাচশ্চার্যবাচঃ সর্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ।।(মনু.১০/৪৫)[৫]
তাই সুনির্দিষ্টভাবে 'দলিত' বলতে কাদের বোঝানো যাবে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে মতভেদ থেকেই গেছে। Eva-Maria Hardfmann তাই লিখেছেন:

"Scholars and activists use the term 'Dalit' in more ways than one; according to the criteria of either social status or economic position. A common usage is to mean the so-called untouchables, or those who are officially defined as 'Scheduled Castes' (SCs)...The most common usage... seems to be to include all caste groups that were traditionally regarded as 'untouchables', although not all of them are now among the official list of SCs. Sometimes, 'Scheduled Tribes' (STs) and even "Other Backward Classes" (OBCs) are included. The other definition in which economic criterion is used includes the economically disadvantaged, regardless of caste category. This has been a common usage among Marxist Scholars."[৬]

তেমনি অন্যদিকে Eleanor Zelliot দলিতের সংজ্ঞা সম্পর্কে বলেছেন:

"The meaning of 'Dalit' in Hindi and Marathi is- "ground down, depressed", and is now used by politicised untouchables in preference to any other designation. The term is one of pride- untouchables have been oppressed by others; there is nothing inherently wrong with them. Their insistence on the use of Dalit has been recognised officially, and the state Government of Maharashtra, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh have issued orders that Dalit be the term used, rather than Harijan, Scheduled Caste, or untouchable."[৬]

উপরোক্ত দলিত বিষয়ে দুটি মতামত-ই যথার্থ মনে হলেও আমার মনে হয় বৈদিক যুগেও সমাজে সব ধরনের উৎপীড়িত ও নির্যাতিত অংশগুলিকে 'দলিত'- অভিধাভুক্ত করার প্রবণতা লক্ষণীয়। ঋগ্বেদের যুগে মোটামুটিভাবে কৌমসমাজের (ট্রাইব, উপজাতি) শাসনই বর্তমান ছিল। এই যুগের উপজাতিসমূহের বসতি বিন্যাস ছিল নিম্নরূপ-

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গান্ধারি, পক্থ, অলিন, ভলানস ও বিষাণী; সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে শিব, পশু, কেকয়, বৃচীবন্ত, যদু, অনু, তুর্বশ ও দ্রুহ্য; আরও পূর্বদিকে তৃৎসু, ভরত, পুরু ও সৃঞ্জয়; পাঞ্জাবের দক্ষিণে মৎস্য ও চেদি। এছাড়াও সিন্ধু ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী অঞ্চলে কৃবি এবং যমুনা-সরস্বতী অঞ্চলে অজ, শীগ্রু ও যক্ষুদের বসতিও উল্লেখ্যযোগ্য। কয়েকটি অবৈদিক জনগোষ্ঠীর উল্লেখও ঋগ্বেদে আছে, যেমন কীকট (মগধ অঞ্চলে), কিরাত, চন্ডাল, পরাঙ্ক শিম্যু প্রভৃতি। এছাড়া আছে পণি, দাস ও দস্যু। দাসদের বলা হয়েছে 'কৃষ্ণত্বচ্', অনাস ও মৃধ্রবাক্ অর্থাৎ তাদের কালো চামড়া, চেপ্টা নাক ও দুর্বোধ্য ভাষা এবং এরা ছিল অস্পৃশ্য বা অচ্ছুত (Untouchable).[৭]

তাই বলা যায় 'দলিত' শব্দটি বিশেষণ, যার আভিধানিক অর্থ- মর্দিত, মাড়ানো হয়েছে এমন অর্থাৎ পদদলিত, পিষ্ট, দমিত এবং নিপীড়িত প্রভৃতি। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন যে, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে, মুসলমানরা ছাড়াও যেসব সামাজিক

গোষ্ঠী কংগ্রেস পরিচালিত বা গোঁড়া হিন্দু পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে নিজেদের অনেকটাই সরিয়ে রেখেছিল, তারা হলেন অব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্য। বিংশ শতকের তিরিশের দশক থেকে অস্পৃশ্যরা নিজেদের দলিত অর্থাৎ নিপীড়িত বলে পরিচয় দিতে শুরু করে।

দীনেশ ডাকুয়া মনে করেন, 'দলিত' শব্দটি এসেছে দলন থেকে যা পূর্বেই বলা হয়েছে। যেহেতু অতীতে মানুষের দ্বারা মানুষের ওপর আক্রমণ হয়েছে মূলতঃ গোষ্ঠীগতভাবে, সেহেতু 'দলনকারী' এবং 'দলিত' মানুষগুলি অনেকসময় ভাগ হয়েছে গোষ্ঠীগতভাবে। অনিলরঞ্জন মনে করেন 'দলিত' শব্দটির পারিভাষিক প্রতিশব্দ 'Depressed', এর ব্যবহার সম্পর্কে ১৯৩১ সালের আদমশুমারির বঙ্গ এবং অসমের অধ্যক্ষ এ.ই.পোর্টার তাঁর পরিশিষ্ট অংশে বলেছেন যে ইউরোপে 'দলিত' শব্দ বোঝায় চিরকালিক দরিদ্র জনগণকে, এছাড়া এই শব্দটি খারাপ আর্থিক অবস্থার দ্যোতক। ১৯৯৭ সালের ২৪শে এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ 'প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে দলিত প্রসঙ্গ' নিয়ে যে আলোচনার ব্যবস্থা করেছিল সেখানে প্রায় সকল বক্তাই 'দলিত' শব্দটির ব্যুৎপত্তি এবং অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেন-নিপীড়িত অবহেলিত শূদ্র ও অন্ত্যবর্ণের মানবগোষ্ঠীকেই উক্ত শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থরূপে প্রতিপাদন করেন।

এছাড়াও প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ভাষার আবির্ভাবের বহু পূর্বের সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ে জাতি বা জাত (Caste) এর পরিবর্তে বর্ণভেদ প্রথা ব্যবহৃত হয়েছে। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে আমরা দেখতে পাই সম্পূর্ণ রূপক ধর্মীয় ভাষায় বলা হয়েছে- ব্রাহ্মণরা সমাজের মস্তিষ্ক (Brain), ক্ষত্রিয়রা সমাজের রক্ষাকর্তা (Defender), এবং বৈশ্য ও শূদ্র সম্প্রদায়রা সমাজের সেবক (Service Provider) ও প্রধান উৎপাদক (Primary Producer) হিসাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে আবার 'কর্ম' ও 'গুণ' অনুসারে বর্ণের অবস্থানের কথা বলা হয়েছে শ্লোকের মাধ্যমে। শ্লোকটি হল-

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্"।। (৪/১৩)

অর্থাৎ প্রকৃতির তিনটি গুণ (সত্ব, রজ ও তমো) ও কর্ম অনুসারে সমাজের চারটি বর্ণও ভগবানের সৃষ্টি। সমাজের সর্বোচ্চ স্তর সৃষ্টি হয়েছে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি-মত্তাসম্পন্ন লোকদের নিয়ে, তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ এবং তাঁরা সত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে শাসক সম্প্রদায়, এদের বলা হয় ক্ষত্রিয় এবং এরা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। তৃতীয় স্তরে রয়েছে বৈশ্য এবং এরা রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। চতুর্থ স্তর হচ্ছে শ্রমজীবী সম্প্রদায়, এদের বলা হয় শূদ্র, এরা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। সৃষ্টি-কর্মের কর্তা হলেও ভগবান অবিনাশী, পরমেশ্বররূপ আমাকে তুমি প্রকৃতপক্ষে অকর্তা বলেই জানবে।[৮]

তাই **রূপকুমার বর্মন** তাঁর রচিত 'জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান' বই-এর পঞ্চম অধ্যায়ে বলেছেন- "দলিত চর্চায় নিযুক্ত ঐতিহাসিকগণ বা সমাজবিজ্ঞানীগণ ভারতীয় সমাজের তপশিলি জাতি, উপজাতি বা পিছিয়ে পড়া শ্রেণির লোকদেরকে দলিত বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রের 'দলিত প্যান্থারদের' কাছে দলিতদের ধারণা অতি স্পষ্ট। ১৯৭০ ও ১৯৮০ র দশকে দলিত প্যান্থার আন্দোলনে বিশ্বাসী ও সমর্থকগণ মনে করতেন 'দলিত হল সামাজিক পরিবর্তন ও বিপ্লবের একটি প্রতীক (symbol of social alternative and revolution) যারা মানবতাবাদে বিশ্বাস করেন। একই সঙ্গে তারা সেইসব ধর্মীয়গ্রন্থ ও শাস্ত্রের বিরোধী যারা সমাজে বিভেদমূলক সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণ তথা সামাজিক অন্যায়ের প্রচার করে। অর্থাৎ দলিত হল সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক। দলিতপন্থীরা অবদমিতদের হয়ে অথবা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে। সৃষ্টিশীল লেখনির দ্বারা। তাই বলা যায় দলিতপন্থীদের কাছে দলিতবাদের অর্থ দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ নয় বরং নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদই তাঁদের পাথেয় ও উদ্দেশ্য। তারা প্রথমদিকে মহারাষ্ট্রের মাহারদের (একটি তপশিলি জাতি) সম্পর্কে দলিত শব্দটির প্রয়োগ করেছিলেন। ধীরে ধীরে দলিতের ধারণার মধ্যে সমস্ত তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (Other Backward Classes) ও সমাজের অন্যান্য দুর্বল অংশকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। দলিতের ধারণা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ১৯৯০ এর দশকে যখন দলিতদের ভারতীয়

সমাজের মূল উৎপাদক (primary producers) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁর একটি প্রবন্ধে কাঞ্চা ইলাইয়া (Kancha Ilaiah) দৃঢ়তার সঙ্গে লিখেছেন:

"The Dalitbahujans are the skilled producers- instrument makers, creative builders of the material basis of society. Conversion of their experience into the framework of knowledge can produce an alternative version of History- the Dalitbahujan alternative.

অর্থাৎ ভারতের অ-দলিতগণ সমাজের পরজীবী ও পরভোজী। তাঁরা দলিত বহুজনদের উৎপাদন ও পরিষেবার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকেন"। অবশ্য খেয়াল রাখা দরকার এটি দলিত বহুজনদের মিলিয়ে মন্তব্যটি করা হয়েছে।

কিন্তু দলিতদের যথাযথ ব্যাখা প্রায়ই অ-দলিতদের (non-Dalit) ধারণায় পরিণত হয় যখন দলিত বলতে তাঁরা কেবলমাত্র অস্পৃশ্যদের বোঝাতে চয়েছেন। বিভিন্ন উদাহরণের মধ্যে অ-দলিতদের কথা স্বীকার করা হয়েছে। যেমন গেইল ওমভেটের (Gail Omvedt) গবেষণার কথা। তাঁর মতে ঔপনিবেশিক আমলে মহারাষ্ট্রের মাহারগণ ছিলেন অস্পৃশ্য তাই তাঁরা হলেন দলিত। ইশিতা ব্যানার্জী দুবে, ঈমতিয়াজ আহমেদ, শশীভূষণ উপাধ্যায় এবং তাঁদের মতো আরো অ-দলিত দলিতচর্চাকারী এই ধরনের ব্যাখাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। উপাধ্যায় লিখেছিলেন-

'The former untouchables are now called Dalit who are voicing their grievances in various level.' একইভাবে পদ্ম ভেলেস্করের ভাষায়- 'Dalit refers to former untouchable caste communities'.[৯]

তাই বলতে পারি যে, সমাজতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় দলিত আন্দোলনের পর্যবেক্ষণ তাত্ত্বিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে দলিত অনেকাংশে সমকালীন আর্থসামজিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত যার মধ্য দিয়েই আন্দোলন চেতনা হয় এবং নিচুতলার জনগণ তাতে যুক্ত হয়ে পড়েন। সুতরাং রূপকুমার বর্মনের মতে বৃহত্তর দলিতবাদের অর্থ হল-

'an aggregate of Dalit ideologies, actions, assertions and demand for justice, struggle for existence and sharing equal location in the domain of knowledge.'[১০]

সর্বোপরি, গণতন্ত্রের সঙ্গে 'মর্যাদাবোধ' (dignity)-এর বিষয়টি 'দলিত' শব্দটিকে রাজনৈতিক ভাবে অধিকতর ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছে। সব মিলিয়ে তাই একটি ব্যাপকতর দৃষ্টিতে বিষয়টিকে অনেকেই দেখতে চাইছেন। (এস.এম.মাইকেল) S.M. Michael তাই মন্তব্য করেছেন-

"The term Dalit is not merely a rejection of the very idea of pollution or impurity or 'Untouchability', it reveals a sense of a unified class, of a movement toward equality."[১১]

অনেকে তাই 'দলিত' শব্দটিকে আবার এমন একটি মতাদর্শ হিসাবে দেখতে শুরু করেছেন, যা ব্যাপক অর্থে সমাজ-কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টযুক্ত। তাই Gangadhar Pantawane মনে করেছেন যে- "Dalit is not a caste. Dalit is a symbol of change and revolution."[১২]

বর্তমানে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে সাধারণভাবে যে বিষয় উঠে আসে তা আলোচনা করা যেতে পারে। দলিতদের সামগ্রিক অধিকার আন্দোলনের প্রায় একই ধরনের দাবী প্রাধান্য পেয়েছে। সেখানে রাষ্ট্রের থেকে কিছু পাওয়া প্রধান হয়ে ওঠে যার ফলে সম্পূর্ণ অধিকারের ধারণা, বিশেষত সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষার প্রসার, পুনর্বাসন, ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা বা স্বীকৃতি লাভ তেমনভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তবে এটাও ঠিক যে সামাজিক ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একাধিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দলিত মানুষেরা অধিকার সম্পর্কে কিছুটা সচেতন হয়েছে। অধিকার অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দায়ীত্ব বা কর্তব্য পালনের নজির দেখতে পাওয়া যায়। ফলে দীর্ঘকালীন ধারণার ধীরে ধীরে পরিবর্তন শুরু হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে অধিকার আন্দোলন হল প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত।

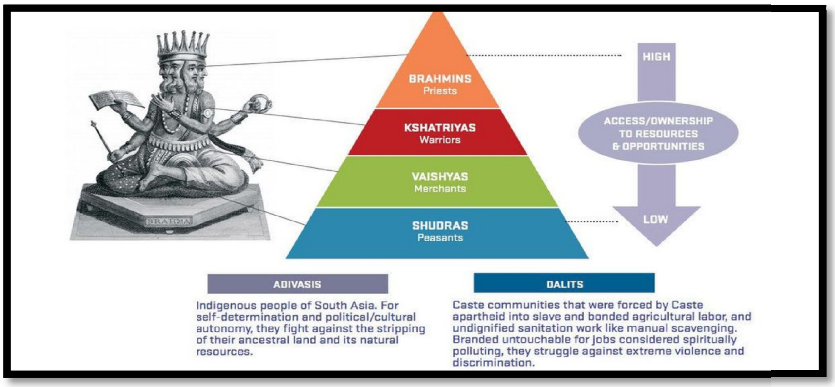

(চিত্র ২. চতুর্বর্ণের উৎপত্তি এবং দলিত পরিচয়)

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://d1u4oo4rb13yy8.cloudfront.net/article/85141-oagzuuyalr-1521723421.jpg&imgrefurl=https://scroll.in/article/872964/my-parents-changed-our-last-name-survey-lays-bare-caste-discrimination-among-south-asians-in-us&docid=WhOolNjpsIKb7M&tbnid=tXk9_YwtdWTM:&vet=1&w=1200&h=630&source=sh/x/im

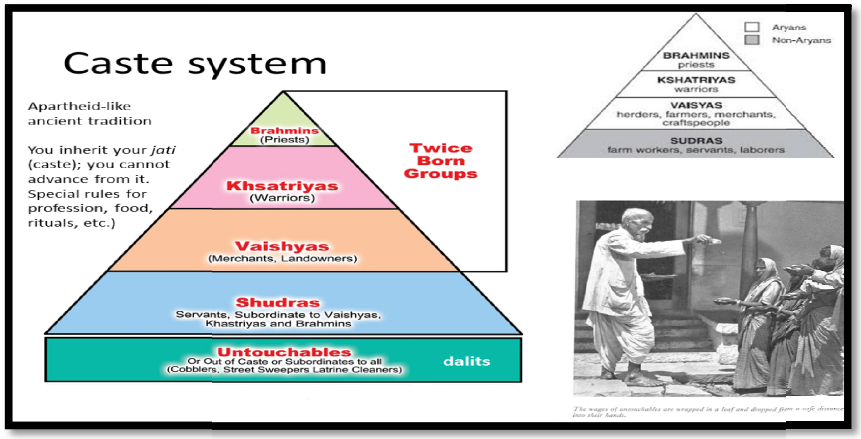

(চিত্র ৩. আর্য ও অনার্যের ভিত্তিতে চতুর্বর্ণ)

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://sites.google.com/site/indiazbc/_/rsrc/1430293643978/caste/INDIA%2520caste%25202.png&imgrefurl=https://sites.google.com/site/indiazbc/caste&docid=4VVkxaQHP54fCM&tbnid=aGLDCuv4qjLroM:&vet=1&w=960&h=720&source=sh/x/im

তথ্যসূত্র

---

১. সুজিত সেন সম্পাদিত, প্রসঙ্গ-দলিত সাহিত্য- দীনেশ ডাকুয়া, দলিত আন্দোলন প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ, কে. মিত্রগ্রন্থমিত্র, কলিকাতা-০৯, প্রথমসংস্করণএপ্রিল, ২০১৩, পৃ.২৭২।

২. S.M. Michael, *Dalits in Modern India: Vision and Values*, Sage, New Delhi (Second Edition) 2007, p.16.

৩. Ghanashyam Shah (ed.) *Dalit Identity and Politics*, Sage, New Delhi, 2001, p. 18.

৪. ড.মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী সম্পাদিত, মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়: সমাজনীতিঃ সঙ্করজাতির উৎপত্তি, চারবর্ণের আপৎকালে বৃত্তিবিধান, শ্লোক ৪৩, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা- ৭০০০০৬, তৃতীয় সংস্করণ স্বাধীনতাদিবস, ১৪১৯, পৃ. ১০২৫।

৫. তদেব, শ্লোক- ৪৫, পৃ. ১০২৬।

৬. Eva-Maria Hardtmann, *the Dalit Movement in India: Local Practies*, Global Connections, Oxford University Press, New Delhi, 2009, p.IX.

৭. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, দ্বিতীয় অধ্যায়: বৈদিক যুগের সমাজ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা-৭০০০৯১, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি, 2017/বি, পৃ.২৩-২৪।

৮. কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক সম্পাদিত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ, চতুর্থঅধ্যায়: জ্ঞানযোগ, শ্লোক১৩, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, ৭৪১৩১৩, পৃ. ১৭১-১৭২।

৯. রূপকুমার বর্মন, জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিতপ্রতর্ক পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান, পঞ্চমঅধ্যায়: দলিত ও দলিতপ্রতর্ক, অ্যালফাবেট বুকস্, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথমপ্রকাশ ২০১৯, পৃ. ১৪৫-১৪৬।

১০. তদেব, পৃ. ১৪৭।

১১. S.M. Michael (ed.) *Dalit in Modern India: Vision and Values*, (Second Edition), Sage, New Delhi, 2007, p. 33.

১২. Ghanshyam Shah, op. Cit, p. 22.

দ্বিতীয় অধ্যায়

অভিজাত বর্ণ বনাম দলিতদের পারস্পরিক সম্পর্ক

দ্বিতীয় অধ্যায়: অভিজাত বর্ণ বনাম দলিতদের পারস্পরিক সম্পর্ক

ভারতীয় উপমহাদেশে মানুষ যখন খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদকে পরিণত হয়েছিল তখনই তারা স্থায়ী গোষ্ঠী গঠন করেছিল, পরবর্তীকালে এই গোষ্ঠী আবার বিবাহ ও জাতিত্বের বন্ধন দ্বারা শক্তপোক্ত হয়েছিল। বহু উপজাতি বা জনজাতি গোষ্ঠী প্রাক্-আর্য সময়ে ছিল। আর্যদের আগমনের পূর্বে যেসব জনগোষ্ঠী ছিল তাদের আর্যরা 'দস্যু' ও 'দাস' নামে অভিহিত করেছে। বস্তুগতঃ পরিপ্রেক্ষিতে বদলের ফলে সামাজিক ভেদাভেদ এবং বৈষম্যের প্রতিলন ঘটে বর্ণ প্রথায়। জন্ম ও উত্তরাধিকার সূত্রের উপর গড়ে ওঠা ব্রাহ্মণ উচ্চতম মর্যাদার অধিকারী, ক্ষত্রিয় দ্বিতীয়, বৈশ্য তৃতীয় এবং শূদ্র সবার নীচে অবস্থান করে। চতুর্বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীনতম অনুমানটি আছে 'ঋগ্বেদে'র 'পুরুষসূক্তে'। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের পুরুষসূক্তে বলা হয়েছে –

ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পুদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ।। (১০/৯০/১২)

এখানে বলা হয়েছে আদি-পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি, বাহু থেকে রাজন্যের, ঊরু থেকে বৈশ্যের ও পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তি।[১]
এছাড়াও মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৩১ সংখ্যক শ্লোকে অবিকল প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হয়েছে-

লোকনান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ।। (১/৩১)

অর্থাৎ লোকবৃদ্ধির জন্য (স্রষ্টা) মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সৃষ্টি করলেন।[২]

জাতি বৈষম্যের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রেনি বর্ণ বৈষম্যের প্রসঙ্গ স্বাভাবিক ভাবে এসে যায় কেননা, আমরা অনেক সময় এদের একটির সঙ্গে অন্যটিকে মিশিয়ে ফেলে ভুল করি। ঋক্-বৈদিক যুগে শ্রেণী বৈষম্য সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও, বর্ণ বৈষম্য সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত। একথা মোটামুটি স্বীকৃত সত্য যে, সে যুগের মানুষ প্রধানত বর্ণের ভিত্তিতে আর্য ও অনার্য, এই দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল।

প্রচলিত জাতিসমূহ ছাড়া সে যুগে ব্রাত্য ও নিষাদ নামে দুটি পৃথক জনগোষ্ঠি ছিল। ড. রায়চৌধুরী বলেছেন, ব্রাত্যরা সম্ভবত ছিল ব্রাহ্মণ ধর্ম বহির্ভূত আর্য। তারা সাধারণত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিধান মানত না এবং যাযাবর জীবনযাপন করত। তবে নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে তারা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারত। নিষাদরা ছিল অনার্য। তারা তাদের নিজস্ব গ্রামে নিজস্ব শাসক, স্থাপত্তীর অধীনে বাস করত।

প্রতিটি বর্ণের বৃত্তি নির্দিষ্ট এবং বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া তা অপরিবর্তনীয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ এমন অনেক সুবিধা ভোগ করতেন, যা বৈশ্য ও শূদ্রের আয়ত্তের বাইরে ছিল। বৈদিক যুগে জাত-বর্ণ ব্যবস্থা নিয়ে তেমন বিধি নিষেধ ছিল না, তা আমরা বহু উদাহরণে দেখতে পাই। যেমন- উচ্চবর্ণের পুত্রের সঙ্গে নিম্নবর্ণের কন্যার বিবাহকে ‘অনুলোম’ এবং নিম্নবর্ণের পুত্রের সঙ্গে উচ্চবর্ণের কন্যার বিবাহকে বলা হত ‘প্রতিলোম’। অসবর্ণ বিবাহের দ্বারা এবং এক বর্ণের মানুষ অপর বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করলে বর্ণ সংকর সৃষ্টি হত। আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক দক্ষতার ভিত্তিতে বা পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণার ভিত্তিতে অথবা শ্রমবিভাজনের ভিত্তিতে সম্ভবত বর্ণব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল এবং বর্ণগুলোর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার বিভিন্ন তাগিদ ছিল।

সেবক শ্রেণীরূপে শূদ্রদের কাজকর্মের কিছু উল্লেখ্য পাওয়া যায়। ‘জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে’ বলা হয়েছে, কোনরকম দেবতা ছাড়াই শূদ্রের উৎপত্তি হয়েছিল প্রজাপতির পা থেকে, আর তাই গৃহস্বামীই হলেন তাঁদের দেবতা এবং তাঁর পা ধুয়েই তাঁদের জীবিকা অর্জন করতে হবে। তাই বলা হয়েছে-

‘শুশ্রুষা শূত্রস্যেতরেষাং বর্ণানাম্’।(স. শ্রৌ. ২৬.১-৭)

অর্থাৎ একটি পরবর্তী সূত্রে যেমন বলা হয়েছে, উচ্চতর বর্ণের শুশ্রুষা করেই তাঁদের বাঁচতে হবে। 'জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে'র প্রথম সূত্রটি থেকে আরো জানা যায় যে, অশ্বমেধের ফলে পোষক বৈশ্য হয়ে ওঠেন ধনী আর উদীয়মান শূদ্র হন কর্মকর্তা। তাই বলা হয়েছে-

'উত্থাতা শূদ্রো দক্ষঃ কর্মকর্তা'। (জৈ. ব্রা. ২।২৬৬)

'কর্মকর্তা' শব্দটি এখানে ভাড়া-করা শ্রমিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকলেও, বেদোত্তর সাহিত্যে অনুরূপ শব্দ 'কর্মকার' এর অর্থ সর্বদাই তাই।[৩] বৃহদারণ্যক উপনিষদে অবশ্য শূদ্রকে বলা হয়েছে 'পূষণ' বা পোষক। 'জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে' ঐ অভিধা 'পোষয়িষ্ণুঃ' বৈশ্যদের প্রতি প্রযুক্ত। তাই বলা হয়েছে-

"স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণমিয়ং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্বং পুষ্যতি যদিদং কিংচ'।। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১।৪।১৩)[৪]

এর থেকে আভাস পাওয়া যায় যে- পুরুষমেধে ব্রাহ্মণদের উৎসর্গ করতে হবে পুরোহিতদের কাছে এবং রাজন্যদের অভিজাত বর্গের কাছে, বৈশ্যদের মরুৎদের (এককৃষকসম্প্রদায়) কাছে, এবং শূদ্রদের শ্রমের কাছে।

সাধরণভাবে সমাজে ব্রাহ্মণ বর্ণের আধিপত্য ছিল, বর্ণগুলির মধ্যে তখনও কিছু সঞ্চারণশীলতা ছিল। বৈদিক যুগেও ব্রাহ্মণের ছেলে জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হত না এবং ব্রাহ্মণের ছেলের অন্য বর্ণে যেতে সংকোচ বা সমস্যা হত না। যোগ্যতা, রুচি ও ক্ষমতা অনুসারে এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণে যেতে পারত। ব্রাহ্মণ মনীষীরা যেমন সমাজকে শাস্ত্র, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, গণিত ইত্যাদি দিয়েছেন, তেমনই দৈনন্দিন জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যায় অনেক কিছুই শূদ্রেরই উদ্ভাবন। গাড়ির চাকা, কুমোরের চাকা, তাঁতির তাঁত, রাজমিস্ত্রির মাপযোকের নকশা ও যন্ত্র, চাষের সেচপদ্ধতি, ঘর ছাওয়ার কৌশল, মাছ ধরার নানা ধরনের জাল, শিকারির ফাঁদ-গুলতি, তীর-ধনুক, ধাতু গলানোর কৌশল, পাথর কাটা ঘষা, অস্ত্রশস্ত্র তৈরি, প্রাসাদ, বাগান,

বিহার, গুহা তৈরি-এ সব শূদ্রের উদ্ভাবন ও সৃষ্টি বললে অত্যুক্তি হবে না। শূদ্রদের নিজস্ব রচনা নাচগানও নিশ্চয় ঘুরপথে সমাজে পৌঁছে উচ্চবর্ণের সংস্কৃতির ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

ঋগবেদের যুগে শ্রমবিভাজন অনেকদূর এগিয়ে গেলেও তাদের মধ্যে কোন সামাজিক বিভাজন ছিল না। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সঞ্চারনশীলতা ছিল। যোগ্যতা, রুচি ও ক্ষমতা অনুসারে পেশার পরিবর্তন হত।

আর্য-ভূমিপুত্রদের মিলনের অসংখ্য উদাহরণ পাই রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যে। মূলত অবাধ বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে জন্মলাভ করেছে এই দুই মহাকাব্যের প্রধান প্রধান চরিত্র। এমনকি মহাভারতীয় সমাজে জারজ সন্তানরাও স্বীকৃত হতো যগ্যোতার ভিত্তিতে এবং গুণের ভিত্তিতে। বিশ্বামিত্র তার বড় প্রকৃষ্ট উদাহরণ; যিনি ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ ধর্মে উন্নীত হয়েছিলেন।

তাহলে কি বলা যেতে পারে বেদ-রামায়ণ-মহাভারতের কালের পরই রক্তের বিশুদ্ধভিত্তিক জাতের উৎপত্তি? না, তা বলা যায় না। কারন আমরা জানতে পারি রামায়ণ ও মহাভারতের কাল; ভারতে এই কালের ব্যপ্তি ছিল কমপক্ষে হাজার বছর (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম থেকে পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দ)। একথাও জানা যায় যে জৈন ও বৌদ্ধধর্মে জাত-পাত ছিল না; মূলতঃ সকল মানুষই ছিল সমান। বস্তুতঃ জাত-পাতের বিরোধীতা, ব্রাহ্মণদের আধিপত্য বিনাশ ও যজ্ঞ কর্মে বিরোধিতা করেই বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটেছে। একসময় সমগ্র ভারতবর্ষ হয়ে যায় বৌদ্ধ ধর্ম। তাই বলা যায় বৌদ্ধ আমলে রক্তের বিশুদ্ধতা তো দুরের কথা বরং রক্তের মিশ্রণের ফলে ভারতীয় সকল জাতিই সন্দেহাতীতভাবে সংকরত্ব প্রাপ্ত হয়।

হিন্দুদের সামাজিক ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে, এই জন্মগত জাতিভেদ প্রথাটির বয়স বড় জোর সাত-আট শত বছর। কিভাবে এই প্রথাটির উদ্ভব হয়েছে তার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ড. অতুল সুর (বাংলা ও বাঙ্গালির বিবর্তন: সাহিত্য লোক: ১৯১৪) তাঁর এই গ্রন্থে বাংলার সামাজিক বিবর্তনের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে দেখা যায় যে প্রাক্-পাল যুগে (প্রাক্ ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ) চার বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) কোনো সমাজ ছিল না। অষ্টম শতাব্দির পূর্বে বাংলায় ছিল কৌম (ট্রাইব) উপজাতি ভিত্তিক

সমাজ। সাধারণত জনপদগুলি কৌম জাতির নামেই অভিহিত হতো। এই কৌম জাতিগুলি ছিল: পুণ্ড্র (পোদ), বঙ্গ, কর্বট (কৈবর্ত্য), বাগদি, সদ্ গোপ ও মল ইত্যাদি।

প্রাক্-পাল যুগে আমলে ধীরে ধীরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণরা বাংলায় আসা শুরু করে; তাদের উপাধি ছিল যথাক্রমে শর্মা ও স্বামিন ইত্যাদি। তাদের মধ্যে মূলত গাঁই প্রথা চালু হয়। মূলতঃ যে গ্রামে তারা প্রথম উঠত সেই গ্রামের নামেই গাঁই প্রথা (ভট্ট, চট্ট, বন্দ্যো ইত্যাদি)। এই সময় আবার অব্রাহ্মণ জাতিসমূহের শেষাংশে থাকত: দত্ত, পাল, মিত্র, বর্মণ, দাস, ভদ্র, সেন, দেব, ঘোষ, কুণ্ড, পালিত, নাগ, চন্দ্র, দাম, ভূতি, বিষ্ণু, যশ, শিব ও রূদ্র ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এগুলো এখন 'কায়স্থ' জাতির পদবি হলেও তখন ছিল নিতান্তই নামেরর শেষাংশ (জাতিবাচক নয়)। কারন তখন 'কায়স্থ' বলে কোনো জাতি ছিল না। এই যুগেই রাজকর্মচারী হিসাবে কিছু লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'কায়স্থ' শব্দ ব্যবহৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল রাজকর্মচারী, জাতি নয়। অপরদিকে কিছু লোকের উপাধি হিসাবে পাওয়া যায়: নগরশ্রেষ্ঠী, স্বার্থবাহ ও ব্যাপারী ইত্যাদী। উপাধি থেকে তাদের ব্যবসায়ী হিসাবে মনে হলেও এরা 'বৈশ্য' জাতির লোক ছিল না। এর থেকে অনুমান করা যায় যে প্রাক্-পাল যুগে স্থানীয়দের মধ্যে জন্মগত কোনো জাতিভেদ ছিল না অর্থাৎ সমাজটি ছিল জাত- পাতহীন একটি সমতল সমাজ।[৫]

পরবর্তীকালে অর্থাৎ পাল আমলেও (খ্রিস্টাব্দ ৭৫০-১২০০) সামাজিক চিত্র প্রায় অভিন্ন ছিল। এ যুগে কর্ম বা বৃত্তিভিত্তিক আরও কিছু উপাধির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই বৃত্তিগুলি হল: প্রতিবেশী, ক্ষেত্রকার (ভূমিকর্ষক), কুটম্ব (প্রধান প্রধান গৃহস্ত), মেদ, অন্ধ্র ও চন্ডাল।

এর সঙ্গে সঙ্গে নবম-দশম শতাব্দীর দিকেই ব্রাহ্মণরা জাতিভেদ প্রথার বীজ রোপণ করতে থাকে। তারা সুযোগ বুঝে চার বর্ণের আদলে সমাজকে বিভক্ত করার উদ্যোগ নেয়। ব্রাহ্মণরা বাদে বাংলার সকল মানুষই 'সংকর' এবং 'শূদ্র'; কেবলমাত্র ব্রাহ্মণরাই নির্ভেজাল।

পালযুগেরর পর আসে সেন রাজত্ব (ত্রয়োদশ শতকে)। বল্লাল সেনের সমসাময়িক কালে রচিত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণেই' প্রথম পাওয়া যাচ্ছে বাঙালি হিন্দুর জাতিবিন্যাস। এই

'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' দিয়ে আরম্ভ করে পরবর্তীকালে সামাজিক বিবর্তনের সাথে সাথে হিন্দুর জাতিবিন্যাসও বারবার পরিবর্তন হয়। এই ক্রম বিকাশটি নিচে আলোচনা করা হল:-

১. বৃহদ্ধর্মপুরাণের শ্রেণি বিভাগ:- 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' (দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী) হিন্দুদেরকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এই তিনটি শ্রেণি হল- (ক) উত্তম সঙ্কর (খ) মধ্যম সঙ্কর ও (গ) অন্ত্যজ। উপরোক্ত তিন শ্রেণিতে যে সকল জাতি পড়েছে তা নিম্নে আলোচিত হল:

(ক) উত্তম সঙ্কর: শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ যাদের পুরোহিত হিসেবে কাজ করত তারাই উত্তম সংকর। এদের মধ্যে আছে- ১. করণ, ২. অম্বষ্ঠ, ৩. উগ্র, ৪. মগধ, ৫. গন্ধবণিক, ৬. কাংস্যবণিক, ৭. শঙ্খবণিক, ৮. কুম্ভকার, ৯. তন্তুবায়, ১০. কর্মকার, ১১. সদগোপ, ১২. দাস, ১৩. রাজপুত, ১৪. নাপিত, ১৫. মোদক, ১৬. বারুজীবী, ১৭. সুত, ১৮. মালাকার, ১৯. তাম্বুলি ও ২০. তৈলক।

(খ) মধ্যম সঙ্কর: ১.তক্ষক, ২. রজক, ৩. স্বর্ণকার, ৪. সুবর্ণবণিক, ৫. আভীর, ৬. তৈলক, ৭. ধীবর, ৮. শৌণ্ডিক, ৯. নট, ১০. শবক, ১১. জালিক।

(গ) অন্ত্যজ: ১. গৃহি, ২. কুড়ব, ৩. চন্ডাল, ৪.বাদুর, ৫. চর্মকার, ৬. ঘট্টজীবী, ৭. দোলবাহী ও ৮. মল।

'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' রচনার কিছুকালের মধ্যেই জাতিবিন্যাসটিকে আরও পাকাপোক্ত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। কারণ ইতিমধ্যেই মসুলমান শাসনের ফলে সমাজে হিন্দু-মসুলমান বড় হয়ে ওঠে। ড.সুরের মতে তাই বেদে বিশ্বাসী পণ্ডিতগণ একটি অতিকথন তৈরি করে। বলা হয় হিন্দুদের মধ্যে পিতৃকুল অথবা মার্তৃকুলে উচ্চবর্ণের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আর এটি হচ্ছে দুইরকম বিবাহ অর্থাৎ অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের মাধ্যমে। উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্নবর্ণের মহিলাকে বিবাহ করলে বলা হয় 'অনুলোম বিবাহ' এবং উচ্চবর্ণের নারী নিম্নবর্ণের পুরুষকে বিবাহ করলে বলা হয় 'প্রতিলোম বিবাহ'। এই ধরনের বিবাহ বন্ধন থেকে জন্মলাভকারী সন্তানদের জাতি কি হবে? পিতা ও মাতার জাতিকে ভিত্তি হিসেবে ধরে এ প্রশ্নের সমাধান করা হয়েছে।[৬]

বৌধায়ন ধর্মসূত্র, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মনুসংহিতা, মহাভারত, পরাশর, সূত সংহিতা, উশানস সংহিতা, বিষ্ণুধর্মসূত্র, যাজ্ঞবল্ক্য ও জাতিমালা ইত্যাদি গ্রন্থ অবলম্বন

করে ড. সুর মোট ৩১ টি মিশ্র জাতির উল্লেখ্য করেছেন।[৭] নিম্নে এই মিশ্র জাতির তালিকা দেওয়া হল:

ক্রমিক সংখ্যা	জাতি	পিতা	মাতা
১.	অম্বষ্ঠ	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য
		ক্ষত্রিয়	বৈশ্য
২.	আগুরি	করণ	রাজপুত্র
৩.	উগ্র	ক্ষত্রিয়	শূদ্র
		ব্রাহ্মণ	শূদ্র
		বৈশ্য	শূদ্র
৪.	কর্মকার	বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচি
		শূদ্র	বৈশ্য
		শূদ্র	ক্ষত্রিয়
৫.	করণ	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য
৬.	চর্মকার	শূদ্র	ক্ষত্রিয়
		বৈদেহক	ব্রাহ্মণ
		বৈদেহক	নিষাদ
		অয়োগব	ব্রাহ্মণ
		তিবর	চন্ডাল
		তক্ষণ	বৈশ্য
৭.	তিলি	গোপ	বৈশ্য
৮.	তেলি	বৈশ্য	ব্রাহ্মণ
৯.	তামলি	বৈশ্য	ব্রাহ্মণ
১০.	কংসবণিক	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য
১১.	চণ্ডাল	শূদ্র	ব্রাহ্মণ
১২.	নাপিত	ব্রাহ্মণ	শূদ্র
		ক্ষত্রিয়	শূদ্র
		ব্রাহ্মণ	বৈশ্য
		ক্ষত্রিয়	নিষাদ
১৩.	বাগ্দী	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য

১৪.	হাড়ি	লেট	চন্ডাল
১৫.	সুবর্ণবণিক	অম্বষ্ঠ	বৈশ্য
		বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচি
১৬.	গন্ধবণিক	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য
		অম্বষ্ঠ	রাজপুত্র
১৭.	কায়স্থ	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য
১৮.	কৈবত	নিষাদ	অয়োগব
		শূদ্র	ক্ষত্রিয়
		ব্রাহ্মণ	শূদ্র
		নিষাধ	মগধ
১৯.	গোপ	বৈশ্য	ক্ষত্রিয়
		ক্ষত্রিয়	শূদ্র
২০.	ডোম	লেট	চন্ডাল
২১.	তন্তুবায়	শূদ্র	ক্ষত্রিয়
		বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচি
২২.	ধীবর	গোপ	শূদ্র
		বৈশ্য	ক্ষত্রিয়
২৩.	নিষাদ	ব্রাহ্মণ	শূদ্র
		ব্রাহ্মণ	বৈশ্য
		ক্ষত্রিয়	শূদ্র
২৪.	পোদ	বৈশ্য	শূদ্র
২৫.	মালাকার	বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচি
		ক্ষত্রিয়	ব্রাহ্মণ
২৬.	মাহিষ্য	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য
২৭.	মোদক	ক্ষত্রিয়	শূদ্র
২৮.	রজক	বৈদেহক	ব্রাহ্মণ
		ধীবর	তিবর
		করণ	বৈশ্য
২৯.	বারুজীবী	ব্রাহ্মণ	শূদ্র
		গোপ	তন্তুবায়

৩০.	বৈদ্য	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য
		শূদ্র	বৈশ্য
৩১.	শুড়ি	বৈশ্য	তিবর
		গোপ	শূদ্র

তেমনই অন্যদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় একই বর্ণের পিতা-মাতার সন্তানদেরকে গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে। অতএব এই হিসাবে সমীকরণটি দাঁরায় এইরূপ:

অম্বষ্ঠ= কংসবণিক= নাপিত= গন্ধবণিক= কায়স্ত= নিষাদ= বৈদ্য

অম্বষ্ঠ= করণ= বাগদী= মাহিষ্য।

অর্থাৎ রক্তের মিশ্রণের ভিত্তিতে সকল জাতি সমান। কিন্তু তথাকথিত পণ্ডিত ও অভিজাত শ্রেণীর মানুষেরা সকল জাতি যে সমান, তা করতে দেয় নি। কিন্তু 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' প্রদত্ত সংকরত্ব ভিত্তিক ৩৯টি জাতি তৈরির প্রায় তিন-চারশ বছর পরে (ষোড়শ শতাব্দী) ভিন্ন জাতি তালিকা পাওয়া যায় ময়ূর ভট্টের 'ধর্মপুরাণে'। মনে হয় এটি একটি 'আন্তঃগোষ্ঠী' বিবাহ ভিত্তিক তালিকা। এই তালিকায় উল্লেখিত ৩৮টি জাতি হচ্ছে: ১. সদগোপ, ২. কৈবর্ত, ৩. গোয়ালা, ৪. তাম্বুলি, ৫. উগ্রক্ষেত্রী, ৬. কুম্ভকার, ৭. তিলি, ৮. যোগী, ৯. আশ্বিন, ১০. তাঁতি, ১১. মালী, ১২. মালাকার, ১৩. নাপিত, ১৪. রজক, ১৫. দুলে, ১৬. শঙ্খধর, ১৭. হাড়ি, ১৮. মুচি, ১৯. ডোম, ২০. কলু, ২১. চণ্ডাল, ২২. মাজি, ২৩. বাগদী, ২৪. মেটে, ২৫. স্বর্ণকার, ২৬. সুবর্ণবণিক, ২৭. কর্মকার, ২৮. সূত্রধর, ২৯. গন্ধ বেণে, ৩০. ধীবর, ৩১. পোদ্দার, ৩২. ক্ষয়িত্র, ৩৩. বারুই, ৩৪. বৈদ্য, ৩৫. পোদ, ৩৬. পাকমারা, ৩৭. কায়স্থ ও কেওরা।

এছারাও 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' ও 'ধর্মপুরাণের' শ্রেণি বিভাজনের পরে আরও একটি শ্রেণি বিভাজন করা হয় যার নাম হল 'নবশাখ'। 'নবশাখ' হলেন তারাই যাদের হাত থেকে ব্রাহ্মণরা জল গ্রহণ করত তারাই হলেন 'নবশাখ'। এই নবশাখরা হচ্ছে: ১. তিলি, ২. তাঁতী, ৩. মালাকার, ৪. সদগোপ, ৫. নাপিত, ৬. বারুই, ৭. কামার, ৮. কুম্ভকার ও ৯. মোদক।[৮]

তাই বলা যেতে পারে জাতিভিত্তিক তথাকথিত এই ব্রাহ্মণ্য সমাজ এবং অভিজাত সমাজ ব্যবস্থা হিন্দুদের যে কত ক্ষতি করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাই এর কুফল সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীগণ বারবার সাবধান করে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলা যায়; তিনি বলেছেন: 'যদি প্রয়োজন হয় সমাজ ব্যবস্থার উন্নতি কর, বিধবাদের বিয়ে দাও। জাতিভেদ প্রথার মাথায় বাড়ি মারো। আবার এসব ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের বাড়াবাড়িতে তিনি ভীষণ ক্ষিপ্ত ছিলেন। পরিবর্তন বিরোধী বর্ণ হিন্দুদেরকে তিনি ১০,০০০ বছরের মমি হিসাবে আখ্যায়িত করেন'। [৯]

ঋগবেদের যুগেও একই পরিবারের লোক কবি (স্তোত্রকার), ভিষক (চিকিৎসক) এবং উপল প্রক্ষিনী (যাঁতার যব ভর্জনকারিণী) রূপে কাজ করতেন।

কারুরহং ততো ভিষগুপলপ্রক্ষিনী নানা।
নানাধিয়ো বসুষবোহনু গা ইব তস্থিমেন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব।। (৯/১১২/৩)[১০]

দেখ আমি স্তোত্রকার পুত্র চিকিৎসক কন্যা প্রস্তরের উপর যব ভর্জনকারিনী, আমরা সকলে ভিন্ন কর্ম করছি। যেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠমধ্যে বিচরণ করে, সেরূপ আমরা ধন কামনাতেও তোমার পরিচর্যা করছি। অতএব হে সোম, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। সামাজিক বিভাজন বর্ণভিত্তিক হলে এই শ্লোক রচিত হত না।

(চিত্র ৪. চতুর্বর্ণের বিভিন্ন কর্মকান্ড)

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enIN745IN745&tbm=isch&q=vedas+dalit&chips=q:vedas+dalit,online_chips:untouchability,online_chips:caste&usg=AI4_-kQsE8Ojs7AOQRmChingL8VspaCgbA&sa=X&ved=0ahUKEwj51ujYkpbiAhXCdCsKHUicBa4Q4lYILCgC&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=gwDJPEu9DPkMeM:

তথ্যসূত্র

---

১. *N.K Dutta: Origin and Growth of Caste in India, Calcutta, Firma KLM, Pvt Ltd, 1986,* পৃ.২৫।

২. ড. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী সম্পাদিত, মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায়: সৃষ্টিপ্রকরণ, শ্লোক৩১, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-৭০০০০৬, তৃতীয় সংস্করণ স্বাধীনতাদিবস, ১৪১৯, পৃ. ২১৪।

৩. রামশরণ শর্মা, প্রাচীন ভারতের শূদ্র, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, প্রথম প্রকাশক: ১৯৮৯, কলকাতা-৭০০০১২, পৃ. ৩৯।

৪. অতুল চন্দ্র সেন-সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, উপনিষদ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৭, নতুন সংস্করণ ২০১৩, পৃ. ৬৯৭।

৫. ড. আর এম দেবনাথ, বৌদ্ধ-হিন্দ-মুসলিম সামাজিক বিবর্তন, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, পৃ. ২৩।

৬. তদেব, পৃ. ২৪-২৫।

৭. তদেব, পৃ. ২৬-২৮।

৮. তদেব, পৃ. ২৯।

৯. ড. হরপদ চট্টোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ কথামৃত, বুলবুল প্রকাশন, ১৯১৪।

১০. *Uiversity of Calcutta, Pre-Aryan and Pre-dravidian in India, 1929, p. 16.*

তৃতীয় অধ্যায়

বৈদিক ও বর্তমানের ভিত্তিতে দলিতচর্চা

তৃতীয় অধ্যায়: বৈদিক ও বর্তমানের ভিত্তিতে দলিতচর্চা

বিপুলায়তন বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্য থেকে একটা বিষয় প্রমাণিত যে পঞ্চদশ থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত উত্তর ভারতের সিন্ধু-গাঙ্গেয় অঞ্চলে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে তার পরিব্যাপ্তি হয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে।[১] যে জাতিবর্ণপ্রথা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং আজও পর্যন্ত বিদ্যমান, সেই জাতিপ্রথা ও বর্ণভেদ একই মুদ্রার দুইদিক। বর্ণভেদ বলতে বোঝায় একটি আদর্শগত দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র জনসমাজকে কয়েকটি বিভিন্ন মর্যাদার শ্রেণীতে বিভাজন। পৃথিবীর সর্বত্রই শাস্ত্রজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবি শ্রেনি, শাসক ও যোদ্ধা শ্রেনি, উৎপাদক ও বণিক শ্রেনি এবং শ্রমজীবী শ্রেনি- এই চারভাগে জনসাধারণকে বিভাগ করার প্রয়াস সবযুগেই দেখা যায় এবং প্রাচীন ভারতবর্ষ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়।

নগরায়ণের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল শ্রেণিবিভাজন। আগে আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চার বর্ণের কথা শুনেছি। ক্রমে ক্রমে নানা বিশিষ্ট বৃত্তির প্রয়োজনে এবং বর্ণগুলির মধ্যে ক্রমাগত অন্তর্বিবাহে বর্ণের স্থান নিল জাতি। কিন্তু বর্ণ ও জাতি মুখ্যত বৃত্তিনির্ধারিত। এখন বর্ণ ও জাতিকে পুঙ্খানু-পুঙ্খ ভাবে বিচার করলে যে বিভাজনে সমাজের মুখ্য পরিচয় হল, তা হল শ্রেনি বিভাগ।

গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে, 'কোনও দেবতা থেকেই শূদ্রের উৎপত্তি হয়নি', যদিও ঋগ্বেদে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মার পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তি। কুষাণ যুগের রচনা 'মনুসংহিতায়' দেখা যায় শূদ্র ঊনমানব অর্থাৎ বৃষল।

সামাজিক ও সাহিত্যক আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ সাধারণত উচ্চশ্রেনি ও উচ্চজাতির হাতেই থাকে। তাঁদের তৈরি করে দেওয়া মূল্যবোধকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করাই হচ্ছে রীতি। মনুসংহিতা ও পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে দেওয়া মিশ্রবর্ণের দীর্ঘ তালিকাই বুঝিয়ে দেয় যে, বর্ণ-নির্বিচারে সামাজিক যৌন মেলামেশার ব্যপক চলন অব্যাহত ছিল। যেমন- ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রপিতার সন্তান হল চন্ডাল, মনুর হিসেবে যার পরিচয় 'নরাধম' (মনু. ১০/১২,১৬)। তাকে স্পর্শ করা পর্যন্ত বারণ। অন্যদিকে শূদ্র গর্ভজাত ব্রাহ্মণ সন্তান 'নিষাদ' (মনু. ১০/৮) নামে গণ্য। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যকন্যার মেয়ে ব্রাহ্মণ-সন্তানের মা হলে

ঐ সন্তান 'আভীর' (মনু.১০/১৫)। নিষাদ ও শূদ্রার সন্তান 'পুক্কস'। বাবা ক্ষত্রিয় ও শূদ্রার সন্তান, মা শূদ্র ও ক্ষত্রিয়ার সন্তান- এক্ষেত্রে সন্তানটির পরিচয় 'শ্বপাক' (মনু.১০/১৯)। বাবা নিষাদ, মা শূদ্র ও বৈশ্যের সন্তান হলে তাদের পুত্র দাস বা কৈবর্ত। (মনু. ১০/৩৪)।

এই ভাবে মিশ্র থেকে মিশ্রতর নানা বর্ণের ব্যাখা করতে বসে শাস্ত্রকাররা ভারতবর্ষের মিশ্র জনতার বিপুল বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিয়েছে। আর্য সমাজশৃঙ্খলার ছাতার নিচে তাদের আনার চেষ্টা থেমে থাকেনি। ঝল্ল, কল্ল, নিচ্ছিল, খস, দ্রাবিড় ইত্যাদি জনগোষ্ঠী মনুর দৃষ্টিতে ব্রাত্য রাজন্য (মনু. ১০/১২) অর্থাৎ আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় সন্তান।[২] পৌন্ড্রক, ওড্র দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খস- এরা সবাই নাকি ক্ষত্রিয়-মর্যাদা থেকে অধঃপতিত হয়ে বৃষল বা শূদ্রগোষ্ঠীতে স্থান পেয়েছে।

শনৈকশ্চক্রিয়ালোপদিমাঃক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বংগতালোকেব্রাহ্মণ্যাদর্শনেনচ।। (মনু.১০/৪৩)[৩]

মনু-স্মৃতির পাঠক দেখতে পাবেন মনু তার আলোচনার স্বার্থে জাতিসমূহকে কতগুলি নির্দিষ্টভাগে ভাগ করেছেন। যেমন- ১) আর্য জাতি, (২) অনার্য জাতি, (৩) ব্রাত্য জাতি, (৪) পতিত জাতি এবং (৫) শংকর (মিশ্র) জাতি।

প্রথমত আর্য জাতি বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন চারটি বর্ণকে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র)। আবার অন্যভাবে দেখতে গেলে চতুর্বর্ণ হল আর্য জাতির মূল তত্ত্ব। অপরদিকে অনার্য জাতি বলতে সেই সব সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে যারা চতুর্বর্ণ ব্যবস্থাকে মানে না। অর্থাৎ যে সম্প্রদায়কে দস্যু বলে তুলে ধরা হয়েছে। মনুর মতে তারাই হচ্ছে ব্রাত্য যারা একসময় চতুর্বর্ণ প্রথাকে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা চতুর্বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।[৪] ব্রাত্য বলতে সেই সব জাতিকে বোঝানো হয়েছে মনু তার একটি তালিকা নিম্নে তুলে ধরেছেন:

ব্রাত্য ব্রাহ্মণ	ব্রাত্য ক্ষত্রিয়	ব্রাত্য বৈশ্য
১। ভৃগ্ন কন্টক	১। ঝাল্ল	১। সুধান্বন
২। অবন্ত্য	২। মাল্লা	২। আচার্য

৩। বাতধন	৩। লিচ্ছবী	৩। করুষ
৪। ফুশপদ	৪। নাটা	৪। বিজনমন
৫। শৈখ	৫। করন	৫। মৈত্র
	৬। খাসা	৬। সৎবত
	৭। দ্রাবিড়	

মনুসংহিতায় দশমোহধ্যায়ে দেখা যায়: ১। শূদ্র দস্যু থেকে আলাদা ২। শূদ্র হল আর্য। তাই বলা হয়েছে-

মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ।। (মনু.১০/৪৫)

পতিত জাতির তালিকার ভেতরে মনু সেই সব ক্ষত্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যারা আর্যদের ক্রিয়া-কান্ড ও অনুষ্ঠানাদি না করার এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দেওয়া চাকুরী হারানোর কারণে শূদ্র বলে পরিণত হয়েছে। নিম্নে তাদের তালিকা দেওয়া হল:

১) পৌন্ড্রক, (২) চোল, (৩) দ্রাবিড়, (৪) কম্বোজ,(৫) যবন, (৬) শক, (৭) পারদ (৮) পহ্লব, (৯) চীনা, (১০) কীরাৎ, (১১) দরাড়।

শংকর জাতি বলতে মনু সেই জাতিকে বোঝান যে জাতির লোকেরা এক জাতিভুক্ত পিতামাতার সন্তান নয়। এই মিশ্র জাতিকে মনু নানা শ্রেনিতে ভাগ করেছেন। যেমন- (১) বিভিন্ন আর্যজাতির বংশধর যাদের তিনি দুইটি শ্রেনিতে ভাগ করেছেন-(ক) অনুলোম এবং (খ) প্রতিলোম। (২) অনুলোম ও প্রতিলোম জাতির বংশধর এবং (৩) অনার্য ও আর্য অনুলোম ও প্রতিলোম জাতির বংশধর। মনু যাদেরকে মিশ্র জাতির অন্তর্ভূক্ত করেছেন তাদের নিম্নোক্ত শ্রেণীর মধ্যে দেখানো হল:

(১) মিশ্র আর্য জাতির বংশধর

পিতা	মাতা	বংশধরের পরিচয়	অনুলোমবা প্রতিলোম
ব্রাহ্মণ	ক্ষত্রিয়	?	_
ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	অম্বাষ্ঠ	অনুলোম

ব্রাহ্মণ	শূদ্র	নিষাদ(পারশব)	অনুলোম
ক্ষত্রিয়	ব্রাহ্মণ	সূত	প্রতিলোম
ক্ষত্রিয়	শূদ্র	উগ্র	অনুলোম
বৈশ্য	ব্রাহ্মণ	বৈদেহক	প্রতিলোম
বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	মগধ	প্রতিলোম
বৈশ্য	শূদ্র	করণ	অনুলোম
শূদ্র	ব্রাহ্মণ	চন্ডাল	প্রতিলোম
শূদ্র	ক্ষত্রিয়	শতৃ	প্রতিলোম
শূদ্র	বৈশ্য	আয়োগভ	প্রতিলোম

(২) অনুলোম-প্রতিলোম জাতির সঙ্গে আর্য জাতির মিলনে বংশধর

পিতা	মাতা	বংশধরের পরিচয়
ব্রাহ্মণ	উগ্র	আভৃত
ব্রাহ্মণ	অম্বাষ্ঠ	আভির
ব্রাহ্মণ	আভির	ধিকভান
শূদ্র	নিষাদ	কুকুটক

(৩) অনুলোম ও প্রতিলোম শ্রেনির মধ্যে মিশ্র বিবাহের বংশধরেরা

পিতা	মাতা	বংশধরের পরিচয়
বৈদেহক	আয়োগভ	মৈত্রেয়াক
নিষাদ	আয়োগভ	মার্গভ(দাস)
নিষাদ	বৈদেহ	করাবর
বৈদেহক	অম্বাষ্ট	ভেন
বৈদেহক	করাবর	অন্ধ্র
বৈদেহক	নিষাদ	মেডা
চন্ডাল	বৈদেহ	পান্ডুসোপক
নিষাদ	বৈদেহ	অহিনডক
চন্ডাল	পুক্কাস	সোপক

চন্ডাল	নিষাদ	অন্ত্যভাসিন
ক্ষত্তারি	উগ্র	স্বপাক

মনুর শংকর জাতির তালিকাতে তার উত্তরসূরীরা আরো অনেক জাতির কথা উল্লেখ্য করেছেন বিভিন্ন স্মৃতি শাস্ত্রে। এদের মধ্যে আছেন উশনঃ স্মৃতি, বোধায়ন স্মৃতি, বশিষ্ট স্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি এবং সূত সংহিতার রচয়িতাগণ।

এই বর্দ্ধিতাংশগুলির মধ্যে চারটি হল উশনঃ স্মৃতির তৈরি। নিম্নে তাদের নাম উল্লেখ করা হল-

মিশ্র জাতির নাম	পিতার জাতি	মাতার জাতি
পুলক্ষ	শূদ্র	ক্ষত্রিয়
যেকজ	পুলক্ষ	বৈশ্য
চর্মকারক	আয়োগভ	ব্রাহ্মণ
বেনুক	সূত	ব্রাহ্মণ

আবার চারটি বৌধায়ন স্মৃতির দ্বারা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে:

মিশ্র জাতির নাম	পিতার নাম	মাতার নাম
ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য
ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণ	ক্ষত্রিয়
বৈন	বৈদেহক	অম্বাষ্ট
স্বপাক	উগ্র	ক্ষত্রিয়

বশিষ্ট স্মৃতি মনুর তালিকায় যোগ করেছে মাত্র একটি। যেমন:

মিশ্র জাতির নাম	পিতার নাম	মাতার নাম
বৈশ্য	শূদ্র	ক্ষত্রিয়

মনুর তালিকায় যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি মাত্র দুটি নতুন জাতির নাম যোগ করেছে। যেমন:

মিশ্র জাতির নাম	পিতার নাম	মাতার জাতি
মুর্দ্ধবাসিক	ব্রাহ্মণ	ক্ষত্রিয়
মাহিষ্য	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য

সূত সংহিতায় রচয়িতা এটাকে বিশালমাত্রায় বৃদ্ধি করেছেন। এখানে ৬৩টি জাতির উল্লেখ আছে।[৪] যেমন-

ক্রমিক সংখ্যা	মিশ্র জাতির নাম	পিতার জাতি	মাতার জাতি
১	অম্বষ্টেয়	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য
২	উর্দ্ধনাপিত	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য
৩	কাতকর	বৈশ্য	শূদ্র
৪	কুম্ভকার	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য
৫	কুন্ড	ব্রাহ্মণ	বিবাহিত ব্রাহ্মণ
৬	গোলক	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণ বিধবা
৭	চক্রী	শূদ্র	বৈশ্য
৮	দৌসন্তী	ক্ষত্রিয়	শূদ্র
৯	পত্তনশালী	শূদ্র	বৈশ্য
১০	দৌসন্ত্য	ক্ষত্রিয়	শূদ্র
১১	পুলিন্দ	বৈশ্য	ক্ষত্রিয়
১২	বাহ্যদাস	শূদ্র	ব্রাহ্মণ
১৩	ভোজ	বৈশ্য	ক্ষত্রিয়
১৪	মহিকার	বৈশ্য	বৈশ্য
১৫	মানবিক	শূদ্র	শূদ্র
১৬	ম্লেচ্ছ	বৈশ্য	ক্ষত্রিয়
১৭	শালিক	বৈশ্য	ক্ষত্রিয়
১৮	শুন্ডিক	ব্রাহ্মণ	শূদ্র
১৯	শুন্ডিখ	ক্ষত্রিয়	শূদ্র

২০	সপর্ন	ব্রাহ্মণ	ক্ষত্রিয়
২১	আগ্নেয়নর্তক	অম্বষ্ট	অম্বষ্ট
২২	অপিতার	ব্রাহ্মণ	দৌশন্তি
২৩	আশ্রমক	দন্তকেবল	শূদ্র
২৪	উদবন্ধ	সনক	ক্ষত্রিয়
২৫	করণ	নট	ক্ষত্রিয়
২৬	কর্ম	করণ	ক্ষত্রিয়
২৭	কর্মকার	রেণুকা	ক্ষত্রিয়
২৮	কর্মর	মাহিষ্য	করণ
২৯	কুক্কুন্ডা	মগধ	শূদ্র
৩০	গুহক	স্বপাচ	ব্রাহ্মণ
৩১	চর্মোপজীবন	বৈদেহিক	ব্রাহ্মণ
৩২	চামকার	আয়োগব	ব্রাহ্মণী
৩৩	চর্মজীবী	নিষাদ	কয়শী
৩৪	তক্ষ	মাহিষ্য	করণ
৩৫	তক্ষবৃতি	উগ্র	ব্রাহ্মণ
৩৬	দন্তকাবেলক	চন্ডাল	বৈশ্য
৩৭	দস্তু	নিষাদ	আয়োগব
৩৮	দ্রুমিল	নিষাদ	ক্ষত্রিয়
৩৯	নট	পিচ্ছল্লা	ক্ষত্রিয়
৪০	নাপিত	নিষাদ	ব্রাহ্মণ
৪১	নীলাদিবর্ণবিক্রেতা	আয়োগব	চিরকরী
৪২	পিক্কাহল্লা	মাল্লা	ক্ষত্রিয়
৪৩	পিঙ্গল	ব্রাহ্মণ	আয়োগব
৪৪	ভগ্নবন্ধ	দৌশন্ত	ব্রাহ্মণী
৪৫	ভারুশ	সুধন্ব	বৈশ্য
৪৬	ভৈরব	নিষাদ	শূদ্র
৪৭	মাতঙ্গ	বিজন্ম	বৈশ্য
৪৮	মধুক	বৈদেহিক	আয়োগব
৪৯	মাতাকর	দস্যু	বৈশ্য

৫০	মৈত্র	বিজন্ম	বৈশ্য
৫১	রজক	বৈদেহ	ব্রাহ্মণ
৫২	রথকর	মাহিষ্য	করণ
৫৩	রেণুকা	নাপিত	ব্রাহ্মণ
৫৪	লোহাকর	মাহিষ্য	ব্রাহ্মণী
৫৫	বর্দ্ধকী	মাহিষ্য	ব্রাহ্মণী
৫৬	বর্ষ	সুধন্ব	বৈশ্য
৫৭	বিজন্ম	ভারুশ	বৈশ্য
৫৮	শিল্প	মাহিষ্য	করণ
৫৯	স্বপাচ	চন্ডাল	ব্রাহ্মণী
৬০	সনক	মাগধ	ক্ষত্রিয়
৬১	সমুদ্র	তাকশব্রতী	বৈশ্য
৬২	শতবত	বিজন্ম	বৈশ্য
৬৩	সুনিষাদ	নিষাদ	বৈশ্য

অতএব পাঁচ প্রকার জাতির মধ্যে প্রথম চারটি সম্পর্কে মনু প্রদত্ত ব্যাখা বুঝতে পারা সহজ হলেও পঞ্চম প্রকার অর্থাৎ শংকর (মিশ্র) জাতি সম্পর্কে মনু যে ব্যাখা দিয়েছেন সেক্ষেত্রে একই কথা বলা যায় না। সেখানে নানা রকম প্রশ্ন আমাদের সামনে চলে আসে এবং আমাদের মনকে পীড়া দেয়। মনু প্রদত্ত মিশ্র জাতির তালিকা হচ্ছে অনবধানকৃত তালিকা। অনুলোম-প্রতিলোম জাতিগুলির সঙ্গে আর্য জাতিগুলির মিশ্রণের ফলে যে মিশ্র জাতির সৃষ্টি হয়েছে তার আলোচনাতে মনুর পক্ষে সেই মিশ্র জাতিগুলি ব্যাখা করা এবং নির্দিষ্ট করা উচিত ছিল, যেগুলি চারটি আর্য জাতির প্রত্যেকটি বারটি অনুলোম-প্রতিলোম জাতির প্রত্যেকটির সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার ফলে জন্ম নেয়।[৬] মনু আর্য জাতি ও অনার্য জাতির মিশ্রণে জাতো শংকর জাতির ব্যাখা যেটি দিয়েছেন সেটিও একইরকম ভাবে বৈষম্য মূলক। অর্থাৎ প্রজাপতির মুখ, বাহু, উরু ও পদ্ থেকে জাত যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারবর্ণের বর্হিভূত অথবা চারবর্ণ থেকে বহিষ্কৃত যে সমস্ত জাতি তারা ম্লেচ্ছভাষাভাষী হোক অথবা আর্যভাষাভাষীই হোক তারা সকলে ‘দস্যু’ নামে পরিচিত হবে।

অসাধু শব্দ সমূহের অর্থ অসৎ (অবিদ্যমান) অর্থাৎ সেগুলির মধ্যে অনাদি বাচ্যবাচকতা সম্বন্ধ নেই; সেইরকম ভাষাকে ম্লেচ্ছ বলা হয়। যেমন কিরাত, শবর কিংবা অন্তজগণের ভাষা। আর্যাবর্তনিবাসিগণ 'আর্যবাক্'। যদি তারা চতুর্বর্ণ্যের বহির্ভূত তাহলে তাদের 'দস্যু' বলা হবে। উপরি উক্ত শ্লোকটিতে যা বলা হল তার তাৎপর্যার্থ এই- কোনও একটি বিশেষ দেশে বাস করে সেই দেশের ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার করে বলেই যে সে ব্যক্তি সঙ্করজাতি হবে, সুতরাং ঐ ম্লেচ্ছ ভাষাভাষিত্ব যে বর্ণসঙ্করত্বের কারণ হবে তা বলা হচ্ছে না; কিন্তু যারা ঐ 'বর্বর' প্রভৃতি শব্দে পরিচিত তারা সঙ্করজাতি। প্রজাপতির মুখ থেকে যারা উৎপন্ন তাদের ঐ বর্বরাদি শব্দে প্রসিদ্ধ (পরিচয়) হবে না, কিন্তু ব্রাহ্মণাদি শব্দেই প্রসিদ্ধ হবে। তারা সব 'দস্যু' নামে অভিহিত হয়।

তাই মার্কস-এঙ্গেলস্ লিখেছেন:

"আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে, সব সমাজের ইতিহাস হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস"।

বলা বাহুল্য যে, শ্রেণীগত শোষণের বাস্তবতা থেকেই শ্রেণী বিরোধের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। ভারতবর্ষের শোষণ ব্যবস্থার ইতিহাস কিন্তু কেবলমাত্র শ্রেণী-শোষণগত নয়; তা বর্ণভিত্তিক, জাতিভিত্তিক এবং গোত্র-ভিত্তিকও বটে। ধর্মীয় মোড়কেও এদেশে যুগ যুগ ধরে চলেছে জাতিগত শোষণ- ধর্মগ্রন্থে আর শাস্ত্রবাণীতে রয়েছে তার সগর্ব সর্মথন। সেই সূত্র ধরেই রামায়ণে এসেছে শূদ্র হয়ে বেদ পাঠের অপরাধে রামচন্দ্র-কর্তৃক শম্বুকের মস্তকছেদনের কাহিনী। মহাভারতে পাই একলব্যের সাক্ষাৎ, যেখানে দ্রোণাচার্য তাকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেও গুরুদক্ষিণা হিসাবে তার ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুল দাবি করেছেন। অনধিকার শিক্ষা চর্চার অপরাধ ঘটেছে একলব্যের অঙ্গুলিচ্ছেদন। এই আদর্শের (!) অনুসরণেই বর্ণাশ্রম ধর্মের ঘাড়ে চেপে যুগ যুগ ধরে এদেশে রচিত হয়েছে জাতিগত বৈষম্যের নিদারুণ ইতিহাস। অস্পৃশ্যতা নামক সামাজিক ব্যাধিও এই ইতিহাসের অনুষঙ্গ।[৭]

অতএব এইসব শূদ্র, মিশ্রজাতি, ব্রাত্য ও দস্যু নামে চিহ্নিত মানুষজন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়ে ক্রমশ অধঃপতিত, দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের পঙ্কশয্যায় কালাতিপাত করতে বাধ্য হয়েছে যুগযুগান্তর ধরে।

তথ্যসূত্র

---

১. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, দ্বিতীয় অধ্যায়- বৈদিক যুগের সমাজ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা-৭০০০৫৬, ২০১৭, পৃ.২০।

২. করুণাসিন্ধু দাস, পিছড়ে বর্গ: প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের দর্পণে, সুজিত সেন সম্পাদিত, দলিত আন্দোলন প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ, কে. মিত্রগ্রন্থমিত্র, কলিকাতা-০৯, প্রথমসংস্করণএপ্রিল, ২০১৩, পৃ.২৫৯।

৩. ড. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী সম্পাদিত, মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়: সমাজনীতিঃ সঙ্করজাতির উৎপত্তি, চারবর্ণের আপৎকালে বৃত্তিবিধান, শ্লোক ৪৩, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-৭০০০০৬, তৃতীয় সংস্করণ স্বাধীনতাদিবস, ১৪১৯, পৃ. ১০২৫।

৪. অধ্যাপক সত্যরঞ্জন রায়, হিন্দুধর্মে হেঁয়ালি (বাবাসাহেবের অনন্য গ্রন্থ '*Riddles in Hinduism*'- এর অনুবাদ), হেঁয়ালি নং ১৮ : মনুর পাগলামি অথবা মিশ্রজাতির উৎপত্তি সম্পর্কে ব্রাহ্মণ্য ব্যাখা, প্রত্যুষ পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ: জুন ২০১৬, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ. ২৬২-২৬৩।

৫. তদেব, পৃ. ২৬৪-২৬৫।

৬. তদেব, পৃ. ২৬৭।

৭. দেবনারায়ণ মোদক, সমতা ও সামাজিক ন্যায়: সাম্প্রতিক ভারতে সংরক্ষণের রাজনীতি, সুজিত সেন স্মপাদিত, জাতপাত ও সংরক্ষণ ভারতীয় প্রেক্ষাপট, লেজার কম্পোজ নিউ বৈশাখী প্রেস, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০০৮, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ. ৪৭।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের দর্পণে অপশূদ্র বনাম দলিত

চতুর্থ অধ্যায়: প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের দর্পণে অপশূদ্র বনাম দলিত

"দাসং বর্ণম্ অধরং গুহাক"

আর্য্যেতর জাতি কাল-ক্রমে আর্যসমাজে প্রবেশ করে চতুর্থবিভক্ত শূদ্র জাতি সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্থানলাভ করে। আস্তিক ও নাস্তিকভেদে দর্শন নয় প্রকার। যারা বেদের প্রামাণ্যতাকে স্বীকার করেছেন তারা আস্তিক, আর যারা বেদের প্রামাণ্যতাকে অস্বিকার করেছেন তারা নাস্তিক। ভারতীয় আস্তিক দর্শন হল- সাংখ্য-যোগ, মীমাংসা (পূর্বমীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা), ন্যায়-বৈশেষিক। ভারতীয় নাস্তিক দর্শন হল- চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন।
কর্ম ও জ্ঞান ভেদে মীমাংসা দর্শন দুই প্রকার। ধর্মবিচার করাই হল মীমাংসা দর্শনের মুখ্যতম বিষয়। মীমাংসা দর্শনের দ্বাদশ অধ্যায় রয়েছে। মীমাংসা দর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঁচিশতম সূত্র থেকে আটত্রিশতম সূত্র পর্যন্ত যে অধিকরণ বর্ণনা করা হয়েছে তা হল 'অপশূদ্রাধিকরণম্'। এই 'অপশূদ্র' নামের কি তাৎপর্য? তার উত্তরে বলা হয়েছে-

'অপগতঃ অপস্কৃতঃ, বহিস্কৃতঃ, অপসৃতো বা শূদ্র যেভ্যঃ (বর্ণেভ্যঃ) স অপশূদ্রঃ, তে অপশূদ্রাঃ অর্থাৎ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাঃ, তেষাং অপশূদ্রাণাম্ অধিকরণম্ অপশূদ্রাধিকরণম্ ইতি'। অর্থাৎ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যরূপত্রৈবর্ণস্য গ্রহণং ভবতি'।

অর্থাৎ যে অধিকরণে শূদ্রকে বহিষ্কার করা হয়েছে এমন অধিকরণ হল 'অপশূদ্রাধিকরণম্'। পারতপক্ষে যাদের থেকে শূদ্র অপসৃত হয়ে গেছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য- এই তিনটি বর্ণ- এই তিনটি বর্ণের থেকে শূদ্র তিরোহিত, অপস্কৃত অথবা বহিষ্কৃত তা 'অপশূদ্র'। এই অপশূদ্রের অর্থ হল ত্রিবর্ণ, তার অধিকরণ হল 'অপশূদ্রাধিকরণম্'।[১]
অগ্নিহোত্রাদিকর্মে শূদ্রের অধিকার আছে, কি না? এর উত্তরে মীমাংসাসূত্রকার জৈমিনি সূত্র করেছেন- 'চাতুর্বর্ণ্যমবিশেষাৎ' (৬/২৫)। অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র- এই চতুর্বর্ণের অধিকার বিদ্যমান, যদিও এর পিছনে মূলকারণ বিধিবাক্য আছে- 'স্বর্গোকামো যজেত' অর্থাৎ যাঁরা স্বর্গকামনা করেন তারা যজ্ঞ করবে। ফলে

স্বর্গকে সাধারণ ফলরূপে নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ স্বর্গে অসীম সুখ ও শান্তি বিদ্যমান। সেই স্বর্গসুখ সকল মানুষেরই আকাঙ্ক্ষিত। ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় শূদ্রেরও স্বর্গ প্রভৃতি ফল সমানভাবে আকাঙ্ক্ষিত। প্রার্থিত বিষয়ে চারবর্ণের কোন বিশেষত্ব নাই। আর শাস্ত্র মধ্যেও সেইরকম কোন উল্লেখ্য নাই। ফলে সূত্রের মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে- ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের ন্যায় শূদ্রও অগ্নিহোত্রাদি কর্মের অধিকারী।

'কিং চতুর্ণাং বর্ণানাং তানি ভবেয়ুরুতাপশূদ্রাণাং ত্রয়াণাং বর্ণানামিতি'? অর্থাৎ চার বর্ণের মানুষ কি অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করতে পারবে? 'তানি ভবেয়ুঃ' (অগ্নিহোত্রাদীনি) তানি ভবেয়ুঃ'? অথবা অপশূদ্র ত্রিবর্ণের হবে। যাঁরা শূদ্র নয় এমন বর্ণত্রয়েরই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম অনুষ্ঠান হবে আমরা তাহলে কি পাচ্ছি? চারটি বর্ণকে অধিকার করে বা নিয়ে- 'যজেত জুহুয়াদিত্যেবমাদিশব্দমুচ্চরতি বেদঃ'। অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণাদি চারটি বর্ণকে নিয়েই তো বেদ। কারণ মানুষ হিসাবে সকলে সমান, কোন জায়গায় বিশেষ কিছু উপাদান গ্রহন করেন নি। 'চাতুর্বর্ণ্যম্' বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ চতুর্বর্ণ বলেছেন, সেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র- এভাবে পৃথক কিছু বলেন নি। 'তস্মাচ্ছূদ্রো ন নিবর্ততে'- অতএব শূদ্রকে সরিয়ে দেওয়া যাবে না। শূদ্রের অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্মে নিবৃত্তি নাই। এবং স্বর্গের মতো শ্রেষ্ঠ ফল তো সব বর্ণেরই ঈপ্সিত। অতএব অগ্নিহোত্রাদি কর্ম শূদ্রও করতে পারে। পরবর্তী শ্লোকে জৈমিনি উল্লেখ্য করেছেন-

নির্দেশাদ্বা ত্রয়াণাং স্যাদগ্ন্যাধেয়ে হ্যসংবন্ধঃ ক্রতুষু, ব্রাহ্মণশ্রুতিরিত্যাত্রেয়ঃ।।২৬।।

অর্থাৎ 'ত্রয়াণাং নির্দেশাৎ' এর দ্বারা তিনটি বর্ণের নির্দেশ করা আছে। এই তিনটি বর্ণ হল- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। এই তিনটি বর্ণের 'অগ্ন্যাধেয়ে' অগ্নির আধান করা বিষয়ে অর্থাৎ অগ্নি চয়ন করার বিষয়ে 'হ্যসম্বন্ধঃ ক্রতষু' অর্থাৎ যজ্ঞেতে সম্বন্ধ নাই। 'ব্রাহ্মণশ্রুতিরিত্যাত্রেয়ঃ' অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণশ্রুতি' = ব্রাহ্মণ বলে বলা আছে, শ্রুতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণের নাম সর্বদা শ্রুত বা শ্রবণ করা হয়- আত্রেয় মুনি একথা বলে গেছেন।[২]

আবার 'বাশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি'- 'বা' শব্দ অন্য পক্ষকে বারণ করা হয়েছে। 'ত্রয়াণামধিকারঃ স্যাৎ' অর্থাৎ তিনটি বর্ণের অধিকার আছে। আত্রেয় মুনি তাই বলেছেন- 'ত্রয়াণাম্ অধিকারঃ স্যাৎ'।

কুতঃ? কোথা থেকে জানলে? 'অগ্ন্যাধেয়ে নির্দেশাৎ' অর্থাৎ অগ্ন্যাধানবিষয়েতে এইরূপ নির্দেশ করা হয়েছে অর্থাৎ তিনটি বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য)। অর্থাৎ অগ্ন্যাধান বা অগ্নিচয়ন করবে কারা? এর উত্তর হল- তিনটি বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) মানুষ অগ্ন্যাধান করবে। অন্যবর্ণ অর্থাৎ শূদ্র অগ্ন্যাধান করতে পারবে না। 'অগ্ন্যাধেয়ে নির্দেশাৎ' অর্থাৎ অগ্ন্যাধান বিষয়ে নির্দেশ করা হয়েছে। অতএব বলা যেতে পারে 'অগ্ন্যাধেয়ে ত্রয়াণাং নির্দেশো ভবতি'। অগ্নিচয়ন বিষয়ে তিনটি বর্ণের নির্দেশ করা হয়েছে। এছাড়াও তিন বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) কোন কোন ঋতু তে অগ্নিচয়ন করবে সে বিষয়ে বলা হয়েছে-

'বসন্তে ব্রাহ্মণোহগ্নীনাদধীত' অর্থাৎ বসন্তকালে ব্রাহ্মণ অগ্ন্যাধান করবে। 'গ্রীষ্মে রাজন্যঃ' অর্থাৎ ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মকালে অগ্নির আধান করবে, 'শরদি বৈশ্য ইতি' অর্থাৎ শরৎকালে বৈশ্য অগ্ন্যাধান করবে।

এছাড়াও চতুর্থতম বর্ণ অর্থাৎ শূদ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'শূদ্রস্য অগ্ন্যাধেয়ে শ্রুতির্নাস্তি ইত্যনগ্নিঃ'। অতএব শূদ্রের অগ্ন্যাধানবিষয়ে কোন শ্রুতি বা বেদ বলে কিছু নাই। 'অনগ্নিঃ শূদ্র'– অর্থাৎ শূদ্র হচ্ছে অনগ্নি, অর্থাৎ কাছে অগ্নি নাই, অর্থাৎ অগ্ন্যাধান না থাকায় শূদ্রের অগ্নি নাই। অর্থাৎ শূদ্র অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করতে পারবেনা। 'অনগ্নিঃ শূদ্রঃ অসমর্থঃ অগ্নিহোত্রাদি নির্বর্তয়িতুম্'। অর্থাৎ অনগ্নি শূদ্রের অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করার সামর্থ্য নেই, অর্থাৎ শাস্ত্র তা বলেনি।

তাহলে শাস্ত্র কি বলেছে? তার উত্তর হল- **'নির্দেশাদ্ বা ত্রয়াণাং অগ্ন্যাধেয়ে'**- অর্থাৎ অগ্ন্যাধান বিষয়ে মাত্র তিনটি বর্ণের নির্দেশ করা আছে। অর্থাৎ অগ্ন্যাধান করবে মাত্র তিন বর্ণ। **'হ্যসম্বন্ধঃ ক্রতুষু'**– অতএব 'ক্রতুষু হ্যসম্বন্ধঃ', ক্রতু বা যজ্ঞে শূদ্রের সম্বন্ধ নাই। **'ব্রাহ্মণশ্রুতিঃ ইতি আত্রেয়ঃ'**- ব্রাহ্মণবিষয়ে শ্রুতি বা শ্রবণ করা হয় এটাই শ্রুতিতে বলা আছে, এবিষয়টি আত্রেয় মুণি বলেছেন।

'তস্মাৎ অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম ইত্যেবমাদিষু শূদ্রস্য প্রাপিকা শ্রুতির্নাস্তি'। তাই 'অগ্নিহোত্র করবে স্বর্গকামনায়' ইত্যাদি বিষয়ে শূদ্রের কোন পাপকশ্রুতি নাই। 'ব্রাহ্মণাদীনেবাধিকৃত্য সা প্রবর্ততে'। এই শ্রুতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে উদ্দেশ্য করেই প্রবৃত্ত হয়েছে। 'তে হি সমর্থা'– অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবিষয়ে সমর্থ।

অর্থাৎ যোগ্য ব্যক্তি এবং যোগ্যতা তাঁদের আছে। যেহেতু তাদের কাছে বৈধ বা যোগ্য অগ্নি আছে, অতএব ত্রিবর্ণের মানুষই অগ্নিহোত্র করতে পারবে।

'আহবনীয়াদয়োনশূদ্রস্য'[৩]

তিন প্রকারের অগ্নি আছে, সেই অগ্নি গুলি হল-

১) আহবনীয় অগ্নি

২)গার্হপত্য অগ্নি

৩)দক্ষিণাগ্নি

আহবনীয়াদি অগ্নি শূদ্র চয়ন করতে পারবে না। 'সংস্কারশব্দত্বাচ্চ আহবনীয়াদীনাম' অর্থাৎ আহবনীয়াদি অগ্নি বিষয়ে সংস্কার শব্দটি বলা আছে। অর্থাৎ আহবনীয় অগ্নি, গার্হপত্য অগ্নি এবং দক্ষিণাগ্নির সংস্কার করবে। এই সংস্কার কেবলমাত্র ত্রিবর্ণের মানুষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রেণীর মানুষরায় করতে পারবে। এই ত্রি বর্ণের মানুষ ব্যতিত চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ শূদ্র করতে পারবে না। তাই আত্রেয় মুণি বলে গেছেন-

'তস্মাদনধিকৃতোহগ্নিহোত্রাদিষু শূদ্রঃ'

অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদিতে শূদ্রের কোন আধিকার নেই। এছাড়াও বেদে 'আদধীত' এই পদে আত্মনেপদ থাকায় 'স্বরিতঞ্জিতঃ কর্তভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে' সূত্র থাকায় আত্মগামী ক্রিয়াফল হলে আত্মনেপদ হয়। ফলে যে ব্যক্তি অগ্ন্যাধান করবে সেই ফল পাবে। অর্থাৎ কোন শূদ্র কোন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে আহবনীয় অগ্নি ক্রয় করে যজ্ঞ করতি পারবে না। আর লৌকিক বা অসংস্কৃত অগ্নিতে যজ্ঞ অবৈধ। কারন অবৈধ অগ্নির দ্বারা যজ্ঞ করলে যজ্ঞ নিষ্ফল হবে যা 'ভস্মে ঘি ঢালার' ন্যায় হবে। অতএব বলা যায় যজ্ঞকর্মে শূদ্রের কোন আধিকার নেই। এটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে আলোচ্য সূত্রে।

- পুনরায় 'অপশূদ্রাধিকরণম্'-এর ২৭তম সূত্রে বলা হয়েছে-

‘নিমিত্তার্থেন বাদরিস্তস্মাস্তর্বাধিকারং স্যাৎ’।(৬/২৬)

অর্থাৎ বাদরি নামক মুনি বলেন যে- সকলেরই অধিকার থাকবে নিমিত্তার্থপ্রযুক্ত। যজ্ঞাদিকর্ম বিষয়কশাস্ত্র সকলের জন্য বা সকলের অধিকার হবে অর্থাৎ ইহার অধিকারী চতুর্বর্ণই হবে।[৪]

বাদরি মুনি মন্তব্য করেছেন যে- ‘সকলেরই অধিকার থাকবে নিমিত্তার্থপ্রযুক্ত’। আত্রেয় মুনি পূর্বের সূক্তে বলেছেন- ‘শূদ্রের অগ্নিচয়ন বিষয়ে অধিকার নেই। সেই আত্রেয় মুনির ব্যাখা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলেছেন- ‘তন্ন’, অর্থাৎ তা বলা যায় না। অর্থাৎ সকলেই যজ্ঞ করতে পারবে। অর্থীকে অধিকৃত্য অর্থাৎ উদ্দেশ্য করে ‘যজেত’ এই কথাটা বলা হয়েছে। অর্থাৎ অর্থী হল ফলাকাঙ্ক্ষী। যে ফল চায়, অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করে স্বর্গাদি ফল পাবে, স্বর্গকামনা সকলেই করে। কারণ স্বর্গফল হল শ্রেষ্ঠ ফল বা পরম কাঙ্ক্ষিত। অতএব এই বাক্যটিই সিদ্ধান্ত হয় যে- ‘সকল বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যে বর্ণই হোক সে অগ্নিহোত্রাদি করতে পারবে বা করার ইচ্ছা করবে। তাই বলা হয়েছে-

‘সোহসতি প্রতিষেধবচনে শূদ্রাৎ ন ব্যাবর্তেত’

যেহেতু চতুর্থ বর্ণ বিষয়ে অর্থাৎ শূদ্র বিষয়ে কোনও প্রতিষেধবচন নাই, অতএব ‘শূদ্রান্ন ব্যাবর্ততে’- অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি শূদ্ররাও করতে পারবে। অগ্নিহোত্রাদি করতে শূদ্রের বাধা রইল না। তাই বাদরি মুণি মন্তব্য করেছেন-

‘অসতি প্রতিষেধবচনে’ অর্থাৎ প্রতিষেধবচন যেহেতু নাই, অতএব ‘শূদ্রান্ন ব্যাবর্ত্তেত’- এটাকে শূদ্রের থেকে অপসৃত করতে অর্থাৎ সরিয়ে দিতে তুমি পার না। শূদ্রও সেটি করার অধিকারী’।

প্রত্তুতরে বলা হয়েছে ‘যত্তু অসমর্থোহগ্ন্যভাবাদিতি’– প্রতিষেধবচন তো একটা আছে। কারণ ‘অসমর্থঃ অগ্ন্যভাবাৎ’- যেহেতু শূদ্রের কোন অগ্নি নেই, অতএব সে অসমর্থ অর্থাৎ অযোগ্য, এটা একটা বাধা আছে। ‘স্যাদেব অস্য অগ্নিরর্থপ্রাপ্ত’ অর্থাৎ না অর্থতঃ

তাদের অগ্নি আছে। অর্থাৎ তারা অনগ্নি হলেও কিন্তু অর্থতঃ তাদের অগ্নি আছে। 'কামশ্রুতিপরিগৃহীতত্বাৎ' অর্থাৎ কামশ্রুতিতে শূদ্রদের অগ্নিমত্তার কথা আছে। এখানে তা বলা হচ্ছে। 'ননু অগ্ন্যাধেয়চোদনাব্রাহ্মণাদিসংযুক্তা ন শূদ্রস্যেতি'। এখানে বলা হয়েছে যে অগ্ন্যাধানবিষয়ে যে বিধিবাক্য (= চোদনা) রয়েছে, সেটা ব্রাহ্মণাদিবিষয়ে রয়েছে, শূদ্রের বিষয়ে তো বিধিবাক্য নেই 'ন শূদ্রস্য'।

পুনরায় বলা হয়েছে- 'নিমিত্তার্থেন তাঃ শ্রুতয়ো ন প্রাপিকাঃ'। অর্থাৎ সকল শ্রুতিগুলি নিমিত্তার্থের দ্বারা প্রাপিকা নয়, 'নিমিত্তার্থেন তাঃ শ্রুতয়ঃ'। নিমিত্তার্থ অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণাদিনিমিত্ত' অর্থাৎ বাদরিনামক আচার্য বলেন। 'নিমিত্তার্থেন তাঃ শ্রুতয়ঃ'- সেই শ্রুতিগুলি নিমিত্তার্থে কিন্তু সকলের জন্য সেই শ্রুতিগুলি নয় এবং সকলে সেই শ্রুতি অনুযায়ী কাজ করতে পারবে না। সকলের জন্য সেই শ্রুতি নয়। 'নিমিত্তার্থেন' অর্থাৎ নিমিত্তার্থে সেই শ্রুতিগুলি প্রযুক্ত হবে।[৫]

ব্রাহ্মণনিমিত্তে অর্থাৎ ব্রাহ্মণনিমিত্তার্থে, ক্ষত্রিয়নিমিত্তার্থে এবং বৈশ্যনিমিত্তার্থে প্রযুক্ত হবে, কিন্তু 'ন প্রাপিকা' অর্থাৎ সকলের জন্য প্রাপিকা হবে না। 'কথম্'-কিভাবে জানলে? 'নিমিত্তস্বাভাবা এতে শব্দাঃ'- এই শব্দগুলো নিমিত্তস্বভাব।

'ব্রাহ্মণ আদধানো বসন্তে, রাজন্যো গ্রীষ্মে, বৈশ্যঃ শরদীতি ব্রাহ্মণাদীনাং বসন্তাদিভিঃ সম্বন্ধো গম্যতে'। ব্রাহ্মণ বসন্তকালে অগ্নির আধান করবে, ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মে এবং বৈশ্য শরৎকালে।

তাহলে বসন্ত, গ্রীষ্ম এবং শরৎকালে অগ্নির আধান বলা আছে, এবং কোন কালে শূদ্রের কথা তো বলা নাই, না থাকার জন্য শূদ্র কেমন করে অগ্ন্যাধান করবে? 'তথা চ আদধার্তিন' অর্থাৎ শূদ্র অগ্নিচয়ন করবে না।

'ইতি বাক্যেন' অর্থাৎ 'বসন্তাদিসম্বন্ধার্থা ব্রাহ্মণাদয় ইত্যেব গম্যতে'- এই বাক্য থেকেই থেকেই 'শূদ্রাদ্ব্যাবর্ত্তিতো ভবিষ্যতি'। ভাষ্যে ভাষ্যকার বলেছে- 'নিমিত্তার্থেন তাঃ শ্রুতয়ো ন প্রাপিকাঃ'। নিমিত্তার্থেতে সেই শ্রুতিগুলি প্রযুক্ত হবে, অতএব শূদ্রাদিবিষয়ে সেই শ্রুতির প্রয়োগ নাই শূদ্রের যেহেতু বিদ্যাগ্রহণ নাই, বিদ্যা নাই বা বিদ্যাগ্রহণ করতে পারে না শূদ্ররা অর্থাৎ বৈদিক বিদ্যা প্রভৃতি মোটেই গ্রহণ করতে পারে না তারা, অতএব তাদের অধিকার নাই- এটাই শূদ্রের বিষয়ে সাধন করার নিমিত্ত, সাধন করতে এই 'ষাষ্ঠিক' অর্থাৎ ষষ্ঠ অধ্যায়ে অপশূদ্রাধিকরণটা আরম্ভ হয়েছে।

শূদ্রের আধিকার নেই- এটাই সিদ্ধান্ত। বর্তমান সূত্রভাষ্যের প্রথমার্ধের তাৎপর্য হল- আত্রেয় মুনি বললেন সকলের অধিকার নাই। শূদ্রের অগ্নিচয়নে অধিকার নাই – এই যে বলা হয়েছে তা ঠিক নয়। যারা ফলকামী তাদের উদ্দেশ্য করেই 'যজেত' কথাটা বলা হয়েছে। অতএব শূদ্র ফলকামী, ফলে সেও যজ্ঞ করতে পারবে।

যেহেতু যজ্ঞকর্মটার প্রতিষেধমূলক বচন নাই, অতএব শূদ্রের থেকে তাকে ব্যাবৃত করা বা নিষেধ করা যাবে না এবং যজ্ঞকর্মে শূদ্রকে নিষেধ করা চলবে না। যেহেতু অগ্নি নেই সেহেতু শূদ্র তো অসমর্থ, তাহলে কি করে শূদ্র যজ্ঞ করবে? কিন্তু অর্থতঃ তার অগ্নি আছে।

কামশ্রুতি (=যজেত) তে একথা বলা আছে। 'অত্রাহ। ননু....এতে শব্দাঃ' ত্রিবর্ণকেই এটা বোঝায়। কিন্তু বাদরি মুনি যে সূত্র প্রদত্ত করেছে তা হল- 'নিমিত্তার্থেন বাদরিস্তস্মাৎ সর্বাধিকারং স্যাৎ'। সেখানে বাদরি মুনি বলেছেন- 'নিমিত্তার্থেন' অর্থাৎ ব্রাহ্মণনিমিত্তক, ক্ষত্রিয়নিমিত্তক এবং বৈশ্যনিমিত্তক এই শ্রুতিপ্রয়োগ রয়েছে, অতএব 'সর্বাধিকারং স্যাৎ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের অগ্ন্যাধানে অধিকার আছে। অর্থাৎ এখানে তাৎপর্য হল- শূদ্রনিমিত্তক কোন বিধি না থাকায় ব্রাহ্মণাদির ন্যায় শূদ্রেরও স্বর্গকামনা হতে পারে বলে তার পক্ষে কামশ্রুতি পরিগৃহীত যে অগ্নি তার আধান সার্বকালিক বুঝতে হবে।

অর্থাৎ শূদ্র কোন সময়ে অগ্ন্যাধান করবে, যেহেতু বেদে শূদ্রের জন্য কোন কালের উল্লেখ নাই। সেজন্য বাদরি মুনির মতে অগ্ন্যাধানের অধিকার ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণেরই আছে। ভাষ্যকার বাদরি পূর্বপক্ষদের মত উদ্ধৃত করে বলেছেন-

> "আধানবাক্য এবং অগ্নিহোত্রাদিবাক্য পরস্পর সাপেক্ষ নয়। যেহেতু অগ্নি ছাড়া অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ কর্ম সম্পন্ন হতে পারে না বলে কামশ্রুতিবলে অগ্নি অর্থাপত্তি হয়। আর যেটি অর্থাপত্তির দ্বারা প্রাপ্ত হয় তা বিধি হতে পারে না। সেজন্য নিমিত্তবোধক যে নিমিত্তাদিবাক্য (নিমিত্তার্থেন) তার দ্বারা প্রাপ্ত যে অগ্ন্যাধান তা ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণনিমিত্ত হলে বসন্তকালাদিরূপ গুণ বিহিত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে তাৎপর্য হল- যজ্ঞাদি কর্মের অধিকারি যদি ব্রাহ্মণ হয় তাহলে যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় যে সংস্কৃত অগ্নির প্রয়োজন তা বসন্তকালে আধান করবে, ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মকালে আধান করবে, এবং বৈশ্য শরৎকালে আধান করবে। 'আদধাতির্ন

বাক্যেন' অর্থাৎ 'আদধাতি' বাক্যের দ্বারা 'শূদ্রাৎ ব্যাবর্ত্তিতো ভবিষ্যতি'- শূদ্র থেকে ব্যাবর্ত্তিত হয় আধানটি। শূদ্রের কথা যেহেতু বলা নাই, সেহেতু শূদ্রের থেকে এই যে অগ্ন্যাধানের বিষয়টা ব্যাবর্ত্তিত হবে বা সরে থাকবে। শূদ্রনিমিত্তক কোনও কালের বিধান না থাকায় শূদ্র যেকোন কালে অর্থাৎ সকল ঋতুতেই অগ্নির আধান করতে পারবে এবং সেই সংস্কৃত অগ্নি দ্বারা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করতে পারবে- 'ইহাই বাদরিঃ সর্বাধিকারং শাস্ত্রং মন্যতে'- ভাষ্যবচনের তাৎপর্য"।

➢ পুনরায় শূদ্রের পক্ষে অগ্ন্যাধানের আশঙ্কা করা হয়েছে। তাই অপশূদ্রাধিকরণের ২৮ সংখ্যক সূক্তে বলা হয়েছে-

'অপি বাহন্যার্থদর্শনাদ্যথাশ্রুতি প্রতীয়েত' ।।২৮।।

অর্থাৎ পূর্বপক্ষব্যাবর্ত্তক, অন্যার্থদর্শন আছে বলে, যথাশ্রুতি অর্থাৎ যথাবচন অর্থ প্রতীত অর্থাৎ বিহিত হবে।[৬]

'ব্রাহ্মণাদয়ো হ্যাদানে শ্রুয়ন্তে'- ব্রাহ্মণাদি অগ্নিকে চয়ন করবে বা অগ্নিকে গ্রহন করবে, তা শ্রুতির দ্বারা বোঝা যাচ্ছে। 'তেন ব্রাহ্মণাদিকর্তৃকমাধানম্'- অতএব অগ্নি চয়ন ব্রাহমণাদি কর্তৃকই হবে। 'বসন্তাদিশ্রবণাচ্চ বসন্তাদিকালকম্'- বসন্তাদিকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অগ্নির চয়ন করবে। 'তথা চেদং শূদ্রবর্জিতানামেবানুক্রমণং ভবতি' অর্থাৎ শূদ্রবর্জিত অনুক্রমনিকাকেও আমাদের জানতে হবে। এই নিয়মটি হল শূদ্রের ব্যতিরিক্ত নিয়ম অর্থাৎ শূদ্র ছারাই নিয়ম। তাই বলা হয়েছে-

'শূদ্রবর্জিতানাং ব্রাহ্মণাদীনাম্ ইতি অনুক্রমণম্ ভবতি'।

অর্থাৎ এই ক্রমটি হচ্ছে শূদ্রবর্জিতের অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির। শূদ্রবর্জিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এই যে অনুক্রম অর্থাৎ পরম্পরাটা তা বলা হল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ করবেন বসন্তে, ক্ষত্রিয় করবেন গ্রীষ্মে, আর বৈশ্য করবেন শরৎকালে।

‘বার্হদ্গিরং ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মসাম কুর্যাৎ, পার্থুরশ্মং রাজন্যস্য, রায়োবাজীয়ং বৈশ্যস্যেতি’।

অর্থাৎ ‘বার্হদ্গিরম্’- এই ব্রহ্মসামটি ব্রাহ্মণ করবে, ক্ষত্রিয় পার্থুরশ্ম পাঠ করবে, ‘রায়োবাজীয়’- করবে বৈশ্য, শূদ্রের কোন সাম নেই, ‘ন আমনন্তি’ বেদ বলেন নি।

সেরূপ- ‘আধানে অষ্টসু প্রক্রমেষু ব্রাহ্মণোহগ্নিমাদধীত’ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আটটি প্রক্রম বা পদক্ষেপ করে অগ্ন্যাধান করবে, একাদশ পদক্ষেপ বা প্রক্রম করে ক্ষত্রিয় অগ্ন্যাধান করবে, বৈশ্য দ্বাদশ প্রক্রম বা পদক্ষেপ করে অগ্নির আধান করবে।

কিন্তু অপরদিকে চতুর্থতম বর্ণ অর্থাৎ শূদ্রের ব্রহ্মসাম নেই, ব্রতও নেই এবং প্রক্রমও নেই। তাই বলা হয়েছে- ‘এবমব্রহ্মসমাকমব্রতকমপ্রক্রমকং চ শূদ্রস্য প্রযুক্তমপি কর্ম নিষ্ফলং স্যাৎ’।

ফলে ‘শূদ্রো ন জুহুয়াৎ, যজেত বা’ এবং এই তিনটি অর্থাৎ ব্রহ্মসাম, ব্রত এবং প্রক্রম না থাকা সত্বেও যদি শূদ্র যজ্ঞ করে তাহলে শূদ্রকর্তৃক যজ্ঞ নিষ্ফল হবে।

কিন্তু বেদে তো কোথাও লেখা নেই শূদ্র কর্তৃক যজ্ঞ করতে পারবে না তা সত্বেও শূদ্ররা যজ্ঞ করতে পারবে না কেন? কারন বেদে বলা আছে ‘স্বর্গকামো যজেত অগ্নিহোত্রম্’- স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্রম্ যজ্ঞ করবে। অতএব ‘প্রযুক্তমপি কর্ম নিষ্ফলং স্যাৎ’ অর্থাৎ করলেও নিষ্ফল হয়ে যাবে। ‘তস্মাৎ ন শূদ্রো জুহুয়াৎ, যজেত বা’।

পূর্বপক্ষীরা বলেছিলেন-

> ‘ব্রাহ্মণাদি বিশেষকালে অগ্ন্যাধান করবেন। তা সংগত নয়, কারণ অন্য বচনের দ্বারা যদি আধান প্রাপ্ত হয় তাহলে ব্রাহ্মণাদি বাক্যকে গুণবিধি বলা হত। কিন্তু বচনান্তরের দ্বারা আধানের প্রাপ্ত হয় না বলে উহা গুণবাক্য নয়, কিন্তু উহা উৎপত্তিবিধি। এমন বিশেষকালে বিশেষ ব্যক্তি এই আধানরূপ কর্ম করবে। ফলে শূদ্রের আধান নেই, ফলে আহবনীয় অগ্নির অভাবে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞও শূদ্ররা করতে পারবেনা। আর আধান যে অর্থতঃ প্রাপ্ত বা অর্থাপত্তিলভ্য তাও বলা চলেনা। কারন কামশ্রুতির দ্বারা অগ্নি ছাড়া অগ্নিসাধ্য যজ্ঞাদি সম্ভব নয়। সেখানে অসংস্কৃত অগ্নির প্রাপ্তি হয় বটে, কিন্তু সংস্কৃত আহবনীয়রূপ বিশেষ অগ্নি নেই অর্থাপত্তির দ্বারা অনুমিতিও হবে না’।[৭]

‘বসন্তে ব্রাহ্মণঃ অগ্নীন্ আদধীত’- ইত্যাদি বিশিষ্টবাক্য কর্তৃকালাদিযুক্ত অপূর্ব কর্ম বিহিত হয়েছে। শূদ্রের বিধান নেই বলে তাদের অধিকারও নাই। অর্থাপত্তির দ্বারাও অগ্নিসিদ্ধ নয়, কারণ শূদ্রের কামশ্রুতিলভ্য নয়। ‘বার্হদ্গিরং ব্রাহ্মণস্য সাম কুর্যাত্’, ‘পার্থুরশ্বং রাজন্যস্য’, ‘রায়োবাজীয়ং বৈশ্যস্য’- এই তিনটি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে সাম বিহিত হয়েছে। এগুলি হল ব্রহ্মসাম। কিন্তু শূদ্রের পক্ষে কোনও ব্রহ্মসাম বিহিত হয় নাই।

এইরূপভাবে ‘পয়োব্রতং ব্রাহ্মণস্য’, ‘যবাগূ রাজন্যস্য’ এবং ‘আমীক্ষা বৈশ্যস্য’- এভাবে ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণের জন্য যথাক্রমে পয়ঃ, যবাগূ এবং আমীক্ষা ভক্ষন করে ব্রত করতে বেদ উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু শূদ্রের পক্ষে ব্রতবিষয়ে কিছু বিধান বেদ করেন নি। সেরূপ ব্রাহ্মণের পক্ষে অষ্ট প্রক্রম বা পদক্ষেপ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একাদশ প্রক্রম এবং বৈশ্যের পক্ষে দ্বাদশ পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শূদ্রের প্রক্রম বিষয়ে বেদ কিছু বলেন নি। ফলে সাম, ব্রত ও প্রক্রম ছাড়াই শূদ্র যজ্ঞ করলে তা নিষ্ফল হবে। সেই কারণে সূত্রকার বলেছেন- ‘.....যথাশ্রুতি প্রতীয়তে’ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের ‘যথাশ্রুতি’ অর্থাৎ বেদানুসারে শ্রৌতকর্মের অধিকার হবে।

- পুনরায় আবার সূক্ত করা হয়েছে-

‘নির্দেশাত্তু পক্ষে স্যাৎ’।।২৯।।

অর্থাৎ নির্দেশ অর্থাৎ সামান্যরূপে উল্লেখ আছে বলে, পক্ষপরিবর্তনসূচক, পূর্বকথিত নিমিত্তপক্ষে বসন্তাদিশ্রুতি হবে।

না, এটা কেউ বলতে পারে না। যেহেতু নির্দেশ আছে, অতএব শূদ্রের পক্ষে হতে পারে। যেমন বলা হয়েছে- ‘অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ’। এখানে তো কোনপ্রকারে ব্রাহ্মণাদির কথা বলা হয় নি। অতএব পক্ষে সে যদি ইচ্ছা করে তাহলে শূদ্র যজ্ঞ করবে।

আবার পূর্বসিদ্ধান্তের উপর আক্ষেপ করছে। তাই বলা হয়েছে- ‘শূদ্রস্যাগ্ন্যভাবাদনধিকারোহগ্নিহোত্রাদিষিতি’। শূদ্রের অগ্নি নাই বলে তার অধিকার নাই অগ্নিহোত্র প্রভৃতিতে। ‘অস্তি চ শূদ্রস্য আধানম্’- এই সূক্তের দ্বারা বোঝানো হয়েছে শূদ্রের অগ্ন্যাধান রয়েছে। অগ্নিকে চয়ন করবে শূদ্র। তাই বলা হয়েছে-

‘যে এবং বিদ্বানগ্নিমাধত্তে’ –এইরকমভাবে বিদ্বান যাঁরা অগ্নিকে চয়ন করে, ‘ইতি শাস্ত্রং সামান্যেন’- এই শাস্ত্র সামান্যতঃ হয়ে থাকে। এই শাস্ত্র বিশেষরূপে হয় নি সামান্যরূপে হয়েছে। এবং ‘বিদ্বান্ অগ্নিম্ আদধীত’। সামান্যতঃ এই শাস্ত্র। অর্থাৎ যিনি বিদ্বান্ ব্যক্তি তিনি অগ্নির আধান করবেন। অতএব শূদ্রও বিদ্বান হতে পারেন। অতএব শূদ্রও বিদ্বান্ হতে পারেন। অতএব শূদ্রও অগ্নির চয়ন করবে। তাই ভাষ্যকার বলেছেন- ‘য এবং বিদ্বান্ অগ্নিমাধত্তে, ইতি শাস্ত্রং সামন্যেন’। তারপর আবার ভাষ্যে বলা হয়েছে- ‘ইদমপি নিমিত্তার্থে ভবিষ্যতে’। এটাও সেই নিমিত্তার্থে হবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সামান্যরূপে সকলের নিমিত্তই হবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণনিমিত্তার্থে, ক্ষত্রিয়নিমিত্তার্থে, বৈশ্যনিমিত্তার্থে যেমন তেমনই শূদ্রনিমিত্তার্থেও এই শাস্ত্র হবে। তাই বলা হয়েছে-

‘ইদং শাস্ত্রং সামান্যেন ভবিষ্যতি। তস্মাৎ সর্বাধিকারং শাস্ত্রং ভবিতুমর্হতি ইতি’।

অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র অর্থাৎ সকলেরই অধিকার আছে- অগ্ন্যাধানে এবং যজ্ঞে। এটাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। পূর্বপক্ষীরা পুনরায় আশঙ্কা করেছেন যে-

> ‘‘য এবং বিদ্বানগ্নিমাধত্তে’ অর্থাৎ যে ব্যক্তি এরূপ জেনে অগ্ন্যাধান করে এরূপ শ্রুতিবাক্যে সামান্যভাবে আধান বিহিত হয়েছে, বিশেষভাবে নয়। ফলে অগ্ন্যাধানকর্মে ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের ন্যায় শূদ্রেরও যে অধিকার আছে তা বোধিত হয়েছে। ফলে বসন্তাদি বাক্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে বসন্তকালরূপ গুণের নিমিত্তরূপে উল্লিখিত হয়েছে মাত্র’’।[৮]

অর্থাৎ এখানে তাৎপর্য হল- যদি ব্রাহ্মণ হও তাহলে বসন্তকালে অগ্ন্যাধান করবে, যদি ক্ষত্রিয় হও তাহলে গ্রীষ্মকালে অগ্নির আধান করবে, যদি বৈশ্য হও তাহলে শরৎকালে অগ্নির আধান করবে। আর যদি শূদ্র হও তাহলে যেকোন কালে অগ্ন্যাধান করবে এবং সেই অগ্নি দিয়ে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করবে। এরূপ পুনরায় আশঙ্কা করা হল।

পুনরায় আবার ৩০তম সূত্রে বলা হয়েছে-

বৈগুণ্যান্নেতি চেৎ।।৩০।।

অর্থাৎ 'বৈগুণ্যান্নেতি চেৎ' অর্থাৎ বৈগুণ্য (ক্রতুর) হয় বলে শূদ্রের অধিকার নাই। অর্থাৎ বৈগুণ্যহেতু এইরূপ বাক্য বলা যায় না কারন বৈগুণ্য = নিষ্ফলত্ব। শূদ্র যজ্ঞ করলে পরে ফল হবে না। অর্থাৎ অব্রহ্মসামক, অব্রতক, অপ্রক্রমক- এরূপ শূদ্রের অর্থাৎ সাম নেই, ব্রত নেই, প্রক্রম নেই এমন যে শূদ্র যজ্ঞ করলেও সেই যজ্ঞ ফল দান করবে না। 'ন সাধয়েৎ' কেন? কারন-'বিগুণম্ ইতি তৎপরিহির্তব্যম্' অর্থাৎ এটা গুণহীন হয়ে গেল অর্থাৎ নিষ্ফল হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্মটাও বিপরীত হয়ে গেল।

বেগুণ = বিপরীত, কর্ম। বৈগুণ্য = বিপরীতকর্মকারিত্ব।

এবং সেইরকভাবে শূদ্র যদি যজ্ঞ করে তাহলে বিপরীত কর্ম হয়ে যাবে। অতএব শূদ্রকে পরিহার করতে হবে। পূর্বপক্ষীরা অন্যরূপ আশঙ্কার উল্লেখ্য করে তার খন্ডন করেছেন এবং তার জন্য তারা অপর আশঙ্কা দেখাচ্ছেন- "বৈগুণ্যং ন, ইতি চেৎ"। বৈগুণ্য = নিষ্ফলত্ব। ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণের মানুষ বসন্তাদি কালে এবং শূদ্রের অবিধানে সকল কালে অগ্ন্যাধান করলেও যজ্ঞের অধিকার স্বীকার করলেও তাদের পক্ষে সাম, ব্রত, এবং প্রক্রম না থাকায় যজ্ঞ করলে ঐ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের বৈগুণ্য বা নিষ্ফলত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ঐ যজ্ঞ পন্ড হবে। ফলে বৈগুণ্যবশতঃ শূদ্রের যজ্ঞাদি কর্মে অধিকার নাই, এইরূপ আশঙ্কাও কেউ কেউ করতে পারে।

- পুনরায় আবার ৩১ সংখ্যক সূক্তে বলা হয়েছে-

'ন কাম্যত্বাত্'।।৩১।।

অর্থাৎ উপরি উক্ত আশঙ্কা সঙ্গত নয় কারন যেহেতু শূদ্ররাও কামনা বা বাসনা করতে পারে। পূর্বের সূত্রে বলা হয়েছে- শূদ্র যদি যজ্ঞ কর্ম করে তাহলে বিপরীত কর্ম হবে। 'তৎ পরিহর্তব্যম্' অর্থাৎ শূদ্রকে পরিহার করতে হবে। তাহলে পুনরায় আবার কেন বলা হয়েছে- 'ন, কাম্যত্বাৎ'-না, অর্থাৎ শূদ্রের যজ্ঞকর্মে পরিহার নেই অর্থাৎ শূদ্র যজ্ঞ করতে পারবে। তাই বলা হয়েছে- 'স এষঃ পরিহারঃ' 'ন কামত্বা, স এষ পরিহারঃ'- এরূপ বুঝতে হবে। কারনরূপে বলা হয়েছে শূদ্ররাও কামনা করতে পারে- 'কাময়িষ্যতে শূদঃ'।

'অভীবর্তং নাম ব্রহ্মসাম' অর্থাৎ 'অভীবর্ত' হচ্ছে ব্রহ্মসাম।[৯] 'তদ্ধি অনারভ্য কিঞ্চিদাম্নাতমবিশেষেণ' অর্থাৎ তাকে আরম্ভ না করে অবিশেষে আম্নাত বা পঠিত হয়েছে। 'চক্ষুর্নিমিতমাদধ্যাদিতি', চক্ষুর নিমিত বা বিশেষভাবে বিমিত অবস্থায় এটাকে গ্রহণ করবে। অনিয়তপ্রক্রম শূদ্রের নিয়মিত করা হচ্ছে তাই বলা হয়েছে- 'অনিয়তপ্রক্রমেষু শূদ্রস্য নিয়ম্যতে'।

'ব্রতেহপি, মস্তু শূদ্রস্যেতি' অর্থাৎ ব্রতবিষয়ে 'মস্ত' অর্থাৎ দুধের কেউ উপরিভাগ শর শূদ্র ভক্ষণ করবে। 'সম্বন্ধদর্শনাদধ্যবসীয়তে' অর্থাৎ সম্বন্ধদর্শন দ্বারা অধ্যবসিত হয়। 'মস্তেব শূদ্রস্য' অর্থাৎ মস্তটাই শূদ্র খাবে। তাই বলা হয়েছে- 'তস্মাচ্চাতুবর্ণ্যমধিক্রিয়তে'- অর্থাৎ চারটি বর্ণেরই যজ্ঞে অধিকার আছে এবং চতুর্বর্ণই যথার্থরূপে যোগ্যতা সম্পন্ন। তাই বলা হয়েছে-

> 'দুধ খেয়ে ব্রত করবে ব্রাহ্মণ, যবাগূ খেয়ে ব্রত করবে ক্ষত্রিয়, আমীক্ষা (ছানা) খেয়ে ব্রত করবে বৈশ্য এবং মস্ত অর্থাৎ দই-এর উপরিভাগ খেয়ে ব্রত করবে শূদ্র। যেহেতু কাম্যত্ব আছে শূদ্রের। অর্থাৎ শূদ্রও যেহেতু স্বর্গকামনা করে, শূদ্রের নিকটও স্বর্গটা যেহেতু কাম্য তাই শূদ্রও যজ্ঞের অধিকারী'।

'অভীবর্ত্ত' ব্রহ্মসাম হচ্ছে বিশেষ ছাড়াই কিছু আম্নাত বা কথিত হয়েছে অর্থাৎ সকলের জন্য সমানভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। 'চক্ষুর্নিমিতমাদধ্যাদিতি' অর্থাৎ চক্ষুর নিমিত্ত গ্রহন করবে। যেখানে চক্ষু খুললেই দৃষ্টি পড়বে সেখানেই অগ্নির আধান করবে অর্থাৎ প্রক্রম-এর শূদ্রের বেলায় প্রয়োজন নাই। 'অনিয়তপ্রক্রমেষু শূদ্রস্য নিয়ম্যতে' অর্থাৎ শূদ্র অনিয়তপ্রক্রমে অর্থাৎ কোনও একটা ক্রম গ্রাহ্য না করে, শূদ্র চক্ষুর নিমিত এটা গ্রহণ করবে। অর্থাৎ শূদ্রের বেলায় নিয়ত কোন প্রক্রম বা পদক্ষেপ নেই। অনিয়তপ্রক্রমে শূদ্রের নিয়মিত করা হচ্ছে।

'ব্রতেহপি, মস্তু শূদ্রস্যেতি'- ব্রতবিষয়েও মস্তুভোজন শূদের আছে-এভাবে সম্বন্ধবশতঃ অধ্যবসিত হয়। অতএব শূদ্রের জন্য মস্তুই। অতএব চারটি বর্ণেরই যজ্ঞাদিকর্মে অধিকার আছে। এরূপ পূর্বপক্ষরূপে আক্ষেপ হল।

পুনরায় পূর্বপক্ষী স্বপক্ষের বিরুদ্ধ আশঙ্কার খন্ডনরূপে বলেছেন- 'স্বর্গবিষয়ক কামনা শূদ্রেরও যখন হতে পারে, তখন শূদ্রদেরও অধিকার সামান্যভাবে প্রাপ্ত হয়'। 'অভীবর্ত' নামে যে সাম আছে তা অনারভ্য পঠিত বলে যজ্ঞে শূদ্রের ক্ষেত্রে তা প্রযুক্ত হতে পারে। অতএব শূদ্রের 'সাম' প্রাপ্তি হয়ে গেল। আর 'মন্ত্র শূদ্রস্য'-এই বাক্যে শূদ্রের পক্ষে মন্ত্র বিহিত হওয়ায় শূদ্রের ব্রতও প্রাপ্ত হয়ে গেল। আর প্রক্রম উপদিষ্ট না হওয়ায় প্রক্রম বিনাই শূদ্রের ক্রিয়া বা অগ্ন্যাধান হবে। চক্ষু উন্মোচন যেখানে দৃষ্ট পতিত হবে সেখানেই অগ্নির আধান শূদ্র করবে। অতএব শূদ্রেরও যজ্ঞে অধিকার আছে। ফলে 'চাতুবর্ণ্যমবিশেষাৎ'- এই যে সূত্রটি ছিল তা সমীচীন হল।

- পুনরায় আবার ৩২ সংখ্যক সূত্রে বলা হয়েছে-

'সংস্কারে চ তৎপ্রধানত্বাৎ' ।।৩২।।[১০]

অর্থাৎ সংস্কারবিষয়ে ও তার অর্থাৎ সংস্কার্য পুরুষের প্রাধান্য থাকে বলে তৎপ্রধানত্বাৎ। ব্রততে বিশেষ অবগত হওয়া যায় এবং সেই বিশেষটাই সেখানে হচ্ছে প্রধান। 'পুরুষপ্রাধান্যং হি ব্রতে' অর্থাৎ পুরুষই ব্রতে প্রধান হয়ে থাকে এবং ব্রতাচরণ পুরুষই করবে। 'সংস্কারে চ তৎপ্রাধান্যাৎ'- সংস্কারবিষয়ে তারই প্রাধান্য থাকে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল সংস্কারবিষয়ে কার প্রাধান্য থাকে? ভাষ্যে তার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে পুরুষের প্রাধান্য থাকে। অর্থাৎ সংস্কার প্রভৃতি কার্যে পুরুষেরই প্রাধান্য থাকে।

'কিমতো পুরুষপ্রধানতা'। পুরুষপ্রধানতা কেন? 'এতদতো ভবতি'। তার উত্তরে বলা হয়েছে- 'পুরুষপ্রধানঃ সংস্কারো ন শক্নোতি অনুপসংহ্রিয়মাণঃ তস্য অধিকারং ব্যাবর্তয়িতুম্'। অর্থাৎ সংস্কারটি হল পুরুষপ্রধান। অতএব এটাকে 'অনুপসংহ্রিয়মাণঃ' অর্থাৎ একে উপসংহৃত করা যায় না। উপসংহৃত = গুটিয়ে নেওয়া। অতএব পুরুষের অধিকারকে গুটিয়ে অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত করা যায় না বা ব্যাবর্ত্তিত করা যায় না।

কিন্তু পুরুষের অধিকারকে খর্ব করা যায় না কেন? উপসংহৃত করা যায় না কেন? এর উত্তরে ভাষ্যকার বলেছেন- 'যজেতেতি হি স্বর্গকামেহভিধীয়মানে', 'যজেত' এই কথা বললে পরে অর্থাৎ 'স্বর্গকামো যজেত'- এরূপ বললে পরে 'অভিধীয়মান' বললে পরে

‘তৎকামঃ শূদ্রো নাভিহিত ইতি’। স্বর্গকাম শূদ্র অভিহিত হচ্ছে না, ‘ইতি কথং গম্যতে’। অর্থাৎ শূদ্র যে অভিহিত হচ্ছে না অর্থাৎ পুরুষই তো অভিহিত হচ্ছে, স্বর্গকাম যে পুরুষ আছে সেই যজ্ঞ করবে এটা অভিহিত হচ্ছে, কারণ শূদ্ররূপ যে পুরুষ, সে স্বর্গকাম হলেও সে অভিহিত হচ্ছে না কেন? ‘কিং হি স যাগস্য পুরুষনির্বর্ত্যং ন নির্বর্তয়তি’। অর্থাৎ পুরুষের দ্বারা যেটা করা হয়, ‘পুরুষনির্বর্ত্ত্যম্’ অর্থাৎ যেটা পুরুষসাধ্য, পুরুষকর্তব্য নির্বর্ত্ত্য যে যাগটা সেটা ‘ন নির্বর্ত্তয়তি’। অতএব তাকে তো নির্বর্তন করা যায় না। পুরুষসাধ্য যে যাগটা তাকে শূদ্রের থেকে নির্বর্তন করা যায় না। ব্রতকে নির্বর্ত্তিত করা যায়।

পুরুষসাধ্য যাগকে যেমন শূদ্রের পক্ষে বাধা দেওয়া যায় না, সেরূপ ব্রতটাকে বাধা দেওয়া যায় কি না, তখন ভাষ্যকার বলেছেন- না, বাধা দেওয়া যায় না। ‘সামর্থ্যোপজননায় হি তৎ’- সামর্থ্যের উপজননের নিমিত্ত সেই ব্রতটা।

তাই বলা হয়েছে- ‘যস্যৈবোচ্যেত তস্যৈব তেন বিনা ন সামর্থ্যম্, ‘নান্যস্য’। ‘এবমেব হি ব্রতস্যাঙ্গভাবো, যৎ কর্তারং সমর্থং করোতি’। অতএব ব্রতটা হচ্ছে অঙ্গভাব। এই ব্রত করলে পরে তার যোগ্যতা থাকে না। অঙ্গভাব হয় এবং কর্তাকে সমর্থ অর্থাৎ যোগ্য করে তোলে। যার সেটা প্রয়োজনটা নাই, সে সেই ব্রতকে ছাড়াই যাগ করতে পারবে। অতএব শূদ্রকে বর্জন নয় এবং শূদ্রও যাগ করতে পারবে।

ব্রতবিষয়ে শূদ্রেরও যে উল্লেখ রয়েছে সেবিষয়ে বর্তমান সূত্রের দ্বারা অন্যপ্রকারে বলছেন- “সংস্কারে চ তৎপ্রধানত্বাৎ”। ব্রত পুরুষের সামর্থ্যজনক হওয়ায় অর্থাৎ সংস্কারবিষয়ে পুরুষেরই প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ যার উদ্দেশ্যে পয়োব্রতাদি সংস্কার বিহিত হয়েছে, সে যদি তা না করে তাহলে সেই ব্যক্তিই কর্মে যোগ্য হবে না। কিন্তু যার জন্য তা বিহিত হয় নি, সে যদি তা না করে তাতে তার কোন হানিই হবে না। অর্থাৎ যার উদ্দেশ্যে সংস্কার বিহিত আছে সে যদি সংস্কার না করে তাহলে সে কর্মে যোগ্য হবে না। কিন্তু যার জন্য সংস্কার বিহত হয় নি, সে যদি কর্ম করে তাহলে তার কোন ক্ষতিই হয় না। কামশ্রুতির দ্বারা ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের মতো শূদ্রেরও যখন অধিকার প্রাপ্ত হয় তখন ব্রাহ্মণাদি বিহিত পয়োব্রতাদি না করলে তাঁরা যজ্ঞকর্মের অধিকারী হয় না। কিন্তু শূদ্রের যখন কোন ব্রত বিহিত হয় নি, তখন তার অনুষ্ঠান না করেই শূদ্র যজ্ঞ সম্পাদন

করবে, তাতে শূদ্রের কোন ক্ষতিই হবে না। অতএব সংস্কার্য্য পুরুষের প্রাধান্যবশতঃ ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ যেমন যজ্ঞ করবে, তেমন শূদ্রও করবে।

➢ পুনরায় আবার ৩৩তমসংখ্যকসূক্তেবলাহয়েছে-

অপি বা বেদনির্দেশাদপশূদ্রাণাং প্রতীয়তে।।৩৩।[১১]

পূর্বপক্ষব্যাবর্ত্তক বেদবিষয়ে নির্দ্দেশ আছে বলে শূদ্রকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণিকের অগ্নিহোত্রাদি কর্মে অধিকার প্রতীত হবে। অর্থাৎ অপশূদ্রেরই প্রতীত হচ্ছে বেদনির্দেশহেতু। এবং যে যজ্ঞাদি কর্ম আছে সেগুলি অপশূদ্রদেরই অর্থাৎ শূদ্রভিন্ন ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের। তাই ভাষ্যকার বলছেন-

'এবং ন প্রাপকাণি শ্রবণানীত্যুক্তম্'।

অতএব প্রাপক যে শ্রুতিগুলি আছে, সেগুলি অপশূদ্রদেরই নিমিত্ত। নৈমিত্তিক যাঁরা অর্থাৎ যাঁদের নিমিত্ত এই কথাগুলো বলা হয়েছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের জন্য কথাগুলো থাকলেও শূদ্রের পর্যুদাস অর্থাৎ শূদ্রের অপসারণটা বলতে পারা যায়। অর্থাৎ শূদ্রকে গ্রহন করা হয় না।

আবার এইরকমও বলা যেতে পারে যেখানে ব্রাহ্মণাদি শ্রবণ হবে সেখানে অপশূদ্রদেরই অধিকার। 'কুতঃ'- কিভাবে হয়? 'বেদনির্দেশাত্' অর্থাৎ শ্রুতিতে ব্রাহ্মণাদির কথা বলা আছে। ফলে অপশূদ্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকেরই অধিকার হবে যজ্ঞাদিতে। 'বেদো হি ত্রয়াণাং নির্দেশো ভবতি। বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, গ্রীষ্মে রাজন্যম্, শরদি বৈশ্যমিতি'। বসন্তকালে ব্রাহ্মণের উপনয়ন দেবে, গ্রীষ্মকালে রাজাদের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণের, শরৎকালে বৈশ্যের। অতএব শূদ্র যাগ করতে পারে না, যেহেতু তাদের বেদ নাই।

'বেদাভাবাৎ' অর্থাৎ উপনয়ন হলেই তবে তো তাদের বেদাধিকার হবে। উপনয়ন না হলে বেদাধিকার হবেই না। অতএব বেদ নাই বলে উপনয়নও নাই। অতএব শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার নেই।[১২] অর্থাৎ শূদ্রভিন্ন ত্রৈবর্ণিকেরই অগ্নিহোত্রাদি কর্মে অধিকার হবে।

কারণ বেদের নির্দেশ আছে বলে। আর যেহেতু বেদাধ্যয়নের অঙ্গ হল উপনয়ন। ফলে উপনয়নের বিধান না থাকায় শূদ্রের বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই। আর বেদাধ্যয়নের অধিকার না থাকায় বেদবিহিত যজ্ঞাদিতে শূদ্রের অধিকার নাই। অতএব শূদ্র অগ্নিহোত্রাদি কর্মে অনধিকারী।

- পুনরায় ৩৪তম সূত্রে বলা হয়েছে-

'গুণার্থিত্বান্নেতি চেৎ।।৩৪।।

গুণভূত অধ্যয়নের পার্থী বলে, শূদ্র বেদবিদ্যায় অনধিকারী নয়, এরূপ যদি বলা হয়। যেহেতু তারা গুণার্থী, সেহেতু এটা ঠিক নয়। অর্থাৎ শূদ্রও গুণার্থী। সেকারণে পূর্বের শঙ্কার নিরাস করা যাবে না। শূদ্রেরা হলেন যাচঞাকারী। শূদ্রও তো অধ্যয়ন করতে চায় বা ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। তাই ভাষ্যকার বলেছেন-

'গুণেন অধ্যয়নেন অর্থী শূদ্রঃ'।

অনুপনীত অর্থাৎ উপনয়ন হয় নি এমন শূদ্রও নিজে এসে অধ্যয়ন করবে এবং সেইরূপভাবে সেই শূদ্রের সামর্থ্য জন্মাবে। অর্থাৎ শূদ্রকর্তৃক বেদ পঠিত হবে। বেদ এরূপ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, তাকে শূদ্র অনুপনীত বলে কেন বেদ পাঠ করতে পারবে না। অর্থাৎ স্বয়ং শূদ্র বেদ পড়বে। এবং শূদ্রেরও বেদপাঠে সামর্থ্য আছে এবং বেদ পাঠ করতে কেউ বাধা দিতে পারে না। তাই ভাষ্যকার বলেছেন-

'গুণেনাধ্যয়নেন অর্থী, শূদ্রোহনুপনীতঃ স্বয়মুপেত্যাধ্যেষ্যতে'।

কামশ্রুতির দ্বারা শূদ্রের কর্মাধিকার প্রাপ্ত হয় এবং বেদাধ্যয়ন ছাড়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করতে পারবে না। কিন্তু শূদ্রও জ্ঞান দ্বারা কর্মের গুণ অর্থাৎ অঙ্গস্বরূপ বেদাধ্যয়নের অধিকারী হয়। এবং তার ফলস্বরূপ উপনয়নের বিধান না থাকলে অনুপনীত শূদ্র স্বয়ং

গুরুর নিকট উপস্থিত হয়ে বেদ অধ্যয়ন করবে। সুতরাং শূদ্রও বেদজ্ঞান চায়। বেদজ্ঞান হল গুণবিশেষ। বেদজ্ঞানানন্তর যজ্ঞও শূদ্র করতে পারবে। ফলে শূদ্রের যজ্ঞাদি কর্মে সামর্থ্য হয়। এরূপ আবার আশঙ্কা হল।

➢ পুনরায় আবার ৩৫ তম সূক্তে বলা হয়েছে-

সংস্কারস্য তদর্থত্বাদ্বিদ্যায়াং পুরুষশ্রুতিঃ।।৩৫।।[১৩]

উপনয়ন সংস্কারের ফল বেদাধ্যয়ন বলে, পুরুষশ্রুতি অর্থাৎ পুরুষের শ্রবণ বা উল্লেখ্য আছে এবং তা বেদবিদ্যায় অধিকারী হয়। বিদ্যাবিষয়ে পুরুষশ্রুতিই আছে অর্থাৎ বিদ্যাবিষয়ে পুরুষেরই শ্রুতি অর্থাৎ শব্দ। অর্থাৎ পুরুষবিষয়েতই বেদ বলছেন অর্থাৎ বেদবাদ্যায় অর্জনবিষয়ে পুরুষই সামর্থ্য। এবং সংস্কারটা তদর্থ অর্থাৎ পুরুষার্থের সংস্কার। অতএব 'বিদ্যায়াং পরশ্রুতি' অর্থাৎ বিদ্যাতে যোগ্য হচ্ছে পুরুষ- একথা শ্রুতির বচন। এবং এই সূত্রের ব্যাখ্যা ভাষ্যকার করেছেন এবং তিনি বলেছেন-

> 'বিদ্যাবিষয়ে পুরুষশ্রুতিটাই আছে। বিদ্যালাভেই পুরুষই সমর্থ- এরূপ শ্রুতি আছে। 'উপনয়নস্য সংস্কারস্য তদর্থত্বাৎ'।

বিদ্যালাভের নিমিত্ত উপাধ্যায়ের অর্থাৎ শিক্ষকের কাছে পুরুষকে নিয়ে আসা হয়। অদৃষ্টের জন্য মোটেই নয়, বিদ্যার জন্য। 'নাপি কটং কুড্যং বা কর্তুম'। অর্থাৎ মাদুর তৈরী করতে, বা ভিত্তিস্থাপন করতে আনা হয় তা নয়, শুধু বিদ্যার জন্য তাকে সেখানে আনা হয়। (কুড্য = গৃহের ভিত)।

অদৃষ্টের নিমিত্ত সেই বিদ্যাতে পুরুষের শ্রবণ রয়েছে। অর্থাৎ বিদ্যা অর্জন করলেই তার অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়ে যাবে। কি করে এই কথা বলা যায় এবং কি করে এটার লাভ হল?

এর উত্তরে বলা যায়- আচার্যকরণটাই এবিষয়ে বিধান এবং বিদ্যাগ্রহণটা হল আচার্যকরণ। অর্থাৎ আচার্য না করলে সেই বিদ্যাকে লাভ করা যায় না এবং আচার্য ছাড়া বিদ্যালাভ সম্ভব নয়। তাই বলা হয়েছে-

'আচার্যবান্ পুরুষো বেদঃ'।

আচার্যবান্ পুরুষই সেই বস্তুকে জানতে পারে। তাই ভাষ্যকার বলেছেন- 'আচার্যকরণমেতৎ'।

অতএব শূদ্রের বিষয়ে উপনয়নও নাই, আচার্যকরণও নাই। কিন্তু তদর্থ সম্বন্ধহেতু ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকেরই উপনয়ন আছে, আচার্যকরণও প্রযুক্ত আছে। তাই বলা হয়েছে-

'বেদাধ্যাপনেন চাহহচার্যো ভবতি'।

অর্থাৎ যিনি বেদ পড়ান তিনি হন আচার্য। তাই ভাষ্যকার বলেছেন- 'বেদাধ্যাপনেন আচার্যো ভবতি'। অতএব বেদাধ্যয়ন করবে একমাত্র ব্রাহ্মণাদি (ত্রৈবর্ণিক)। বেদে কথিত আছে- 'শূদ্রস্য ন শ্রুতং বেদাধ্যয়নম্' অর্থাৎ শূদ্রের কোনও জায়গায় বেদাধ্যয়ন শ্রবণ করার কথা নাই। 'অতোহবেদত্বাদসমর্থঃ শূদ্রো নাধিক্রিয়তে'-অতএব তার বেদ নাই বলে শূদ্র কোনদিন অধিকৃত নয়। অর্থাৎ এবিষয়ে যোগ্য হতে পারে না। তাৎপর্য হল- সিদ্ধান্তী পূর্বে বলেছেন যে–'পুরুষশ্রুতিঃ বিদ্যায়াম্'- বেদে বেদবিদ্যাতে ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকের উল্লেখ আছে অর্থাৎ ত্রৈবর্ণিকের উল্লেখ আছে অর্থাৎ ত্রৈবর্ণিক পুরুষই বেদবিদ্যার অধিকারী। কারন বসন্তাদিকালে যে উপনয়নরূপ সংস্কার কর্ম হয় তা পুরুষসংস্কারই এবং তা অধ্যয়নেরই অঙ্গ। 'ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি' বাক্যের দ্বারা প্রোক্ষতি ব্রীহি হল সংস্কৃত ব্রীহি, সেইরূপ সংস্কারের দ্বারাই ব্রীহি যজ্ঞকর্মে ব্যবহৃত হয়। এবং সংস্কৃত ব্রীহি দিয়ে নির্মিত পুরোডাশ দিয়ে যজ্ঞ করলে যেমন ঐ যজ্ঞ বিফল হয় না, আর অসংস্কৃত ব্রীহি দ্বারা যজ্ঞ করলে ঐ যজ্ঞ বিফল হয় না, আর অসংস্কৃত ব্রীহি দ্বারা যজ্ঞ করলে ঐ যজ্ঞ বিফল হয়ে যায় এবং তার দ্বারা অদৃষ্ট ফলেরও লাভ হয় না। সেরূপ উপনয়নের দ্বারা সংস্কৃত ত্রৈবর্ণিক পুরুষ সংস্কৃত হলেও যদি বিনিয়োগ না করে তবে তার সংস্কারও বিফল হয়ে যায়। এজন্য বিনিয়োগ কর্ম অর্থাৎ যজ্ঞ কর্ম আবশ্যক। স্বাধ্যায় বিধির দ্বারা বেদাধ্যয়ন বিহিত আছে। এবং সে বিষয়ে কোনও কর্তা নির্দ্দিষ্ট নাই। কিন্তু স্বাধ্যয় তো কর্তৃসাপেক্ষ হয়। অর্থাৎ কর্তা ছাড়া স্বাধ্যায় সম্ভবপর নয়। উপনয়ন সংস্কৃতি পুরুষের আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি অনুসারে স্বাধ্যায়বিহিত বেদাধ্যয়নে বিহিত আছে। এবং সে বিষয়ে কোনও কর্তা নির্দ্দিষ্ট নাই। কিন্তু স্বাধ্যায় তো কর্তৃসাপেক্ষ

হয়। অর্থাৎ কর্তা ছাড়া স্বাধ্যায় সম্ভবপর নয়। উপনয়নসংস্কৃত পুরুষই আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি অনুসারে স্বাধ্যায়বিহিত বেদাধ্যয়নে অধিকারী হয়।[১৪] বসন্তাদি কালবিহিত উপনয়নের দ্বারা বিহিত সংস্কৃত ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিক পুরষ কর্তা হওয়ায় স্বাধ্যায়বিহিত অধ্যয়নরূপ কর্মের কর্তৃরূপ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়ে যায় বলে তা ছাড়া অন্য কেউ যদি বেদাধ্যয়ন করতে যায়, তাহলে তার পক্ষে বেদাধ্যয়ন অবৈধ হবে। ফলে বিহিত উপনয়নও স্বাধ্যায়বিহিত বেদাধ্যয়ন- এদের মধ্যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব বিদ্যমান। ফলে সংস্কৃত ব্রীহিকেই অবঘাত করে তন্নিষ্পন্ন তন্ডুল দ্বারা পুরোডাশ নির্মাণ করে যজ্ঞের সম্পাদন করতে হয় এবং তাহাই অদৃষ্টফলের জনক হবে। নচেৎ হবে না। সেরূপ উপনয়ন সংস্কৃতি ত্রৈবর্ণিক পুরুষ যদি গুরুর নিকট বেদাধ্যয়ন করে এবং তারপর সেই জ্ঞানের দ্বারা যজ্ঞ নিষ্পন্ন করেন তাহলে সেই যজ্ঞ সম্পন্ন হয় ও অদৃষ্ট লাভ করে। উপনয়ন সংস্কারহীন কোন শূদ্র স্বয়ং বেদাধ্যয়ন করলে কিংবা অর্থের বিনিময়ে বশীকৃত করে কোন লোভী গুরুর নিকট বেদাধ্যয়ন করে তাহলে অধ্যয়ন অবৈধ হয় বলে সেই অধ্যয়নের দ্বারা লব্ধ যে জ্ঞান তা যজ্ঞের উপকারক হবে না। ফলে বেদহীন বলে শূদ্রের যজ্ঞকর্মে কোন অধিকার নেই।

➢ পুনরায় শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার আছে। তাই ৩৬ সংখ্যক সূক্তে বলা হয়েছে-

‘বিদ্যানির্দেশান্নেতি চেৎ’।।৩৬।।

বিদ্যার নির্দেশ অর্থাৎ প্রাপ্তি হয় বলে শূদ্রের অনধিকার নাই । শূদ্র পারবে না কেন ? ‘বিদ্যানির্দেশাৎ’ বিদ্যার কথা তো সেখানে বলা আছে, সেখানে শূদ্র বলে তো আলাদা কিছু বলা নাই বা ব্রাহ্মণ বলে বলা নাই। যেহেতু তার বিদ্যাসম্বন্ধ নাই এবং যোগ্যতাও নেই অতএব শূদ্র হচ্ছে অধিকারহীন, অনধিকৃত অর্থাৎ যোগ্য নয়।

কিন্তু বিদ্যার নির্দেশ করাই আছে। ‘বিদ্যাম্ নির্দেক্ষ্যতি’ অর্থাৎ বিদ্যাতে উপদেশ করবে। ‘তস্মাচ্চাতুর্বর্ণ্যস্যাপি অধিকারঃ’– অতএব চারটি বর্ণই বেদাধ্যয়নে অধিকারী হবে এবং তাঁরা যজ্ঞাদি করতেও পারবে। পূর্বে শূদ্রের বেদাধ্যয়নকে অবৈধ বলা হয়েছে, তা ঠিক নয়। কারণ তারা যদি কামকার প্রাপ্ত স্বেচ্ছাকৃত হয়, তাহলে ঐরূপ বলা সমীচীন হবে।

কিন্তু 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদি রূপ কামশ্রুতিই বিদ্যার নির্দেশ করবে। কামশ্রুতি বলে প্রাপ্ত বিদ্যা হয় এবং সে বিষয়ে শূদ্রের বেদাধ্যয়নও আক্ষেপ বা অর্থাপত্তিলভ্য হয়। ফলে আনুমানিক বিধির দ্বারা বিহিত বলে শূদ্রের সেই বিদ্যা অবৈধ হতে পারে না। সুতরাং বিধি না থাকায় অনুপনীত শূদ্রও যজ্ঞাদি কর্মের জন্য বেদাধ্যয়ন করতে পারে। কারণ স্বর্গরূপ শ্রেষ্ঠ ফল সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। ইহা কামশ্রুতির দ্বারা প্রাপ্ত। অতএব শূদ্র বেদ অধ্যয়নে এবং যজ্ঞাদি কর্মে অধিকারী- ইহা বর্তমান জৈমিনীয়সূত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়েছে।

➢ পুনরায় 'অপশূদ্রাধিকরণম্' এর ৩৭ সংখ্যক সূক্তে বলা হয়েছে-

'অবৈদ্যত্বাদভাবঃ কর্মণি স্যাৎ'।।৩৭।।

অর্থাৎ বৈদ্য অর্থাৎ বিদ্যাযুক্ত নয় বলে, কর্মে অর্থাৎ যজ্ঞাদিকর্মে অভাব অর্থাৎ অনধিকার হবে।[১৬] 'অবৈদ্যত্বাদ্' যেহেতু শূদ্রের বিদ্যার সম্বন্ধ নাই অতএব কর্ম করতে পারবে না। এবং 'শূদ্রঃ অধ্যেষ্যতে'- শূদ্র অধ্যয়ন করবে এরকম কোথাও বলা নাই। 'প্রতিসিদ্ধম্ অস্য অধ্যয়নম্' – এর অর্থাৎ শূদ্রের অধ্যয়নটা নিষেধ করা আছে। 'শূদ্রেণ নাধ্যেতব্যম্'- শূদ্র অধ্যয়ন করবে না। 'অধীয়ানস্যাপ্যধ্যয়নফলং ন ভবতি'। অধ্যয়ন করলেও শূদ্র ফল পাবে না। অর্থাৎ ধর্মাজন বলা হচ্ছে, অর্থাৎ ধর্মাজন বলা হচ্ছে, অর্থার্জন নয়। আরও বলা হল- 'দোষশ্চ জায়তে' এবং দোষ হয়। অতএব বলা যেতে পারে বিদ্যাহীন শূদ্র। অতএব কোন যজ্ঞাদি কর্ম শূদ্র করতে পারবে না। শূদ্র থাকলেও যদি সে বিদ্যালাভ করে তাহলে শূদ্র সেই কর্ম করতে পারবে। তাই বলা হয়েছে- 'বৈদ্যত্বেন সিধ্যেৎ'।

কিন্তু শূদ্র যতই বিদ্যালাভ করুক না কেন তথাপি বিদ্যালাভ করলেও সে 'অনগ্নিত্বাৎ' যেহেতু তার অগ্নি নাই, অগ্নিচয়ন নাই, অতএব সে কর্ম করতে পারবে না। যাগযজ্ঞাদি করতে পারবে না শূদ্র। তাই বলা হয়েছে-

'তথাপ্যনগ্নিত্বাদভাবঃ কর্মণি স্যাৎ''।

তারপর আবার ভাষ্যকার বলেছেন- 'অথ কথমনগ্নিতা'- অর্থাৎ কেন অনগ্নি হবে সে, কেন সে ন্যায় পড়াবে, বিদ্যালয়ে পড়াবে, 'কথমনগ্নিতা ইতি'। কেন অনগ্নি হবে? তখন ভাষ্যকার বলছেন- 'প্রাপকাণি হি ব্রাহ্মণাদীনা বাক্যানি'। ব্রাহ্মণই অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি হচ্ছে অগ্ন্যাধানে সমর্থ। ব্রাহ্মরাই অগ্ন্যাধান করবে এটাই বাক্যের কথা। 'ননু য এবং বিদ্বানগ্নিমাধত্তে' অর্থাৎ যে বিদ্বান্ অগ্নির চয়ন করেন সেখানে আধানের বিধায়ক হচ্ছে বাক্যটা। 'তত্র বসন্তেহগ্নিমাদধীত'- ব্রাহ্মণ বসন্তে অগ্নির আধান করবে। যে এরূপ বিদ্বান্ অগ্নির আধান করবে- ইহা স্তুতির দ্বারা অর্থাৎ স্তুতিমূলক আছে। 'তদানুমানিকম্ প্রত্যক্ষশ্রুতাদ্ দুর্বলম্'। অর্থাৎ প্রত্যক্ষশ্রুতিতে আনুমানিকটা দুর্বল। প্রত্যক্ষশ্রুতি থেকে যে অনুমান তা দুর্বল হয়।

কিন্তু অনুমান করা হচ্ছে- 'শূদ্র কেন পারবে না, শূদ্র কেন বিদ্যাগ্রহণ করতে পারবে না, শূদ্র কেন যজ্ঞ করতে পারবে না? শূদ্রের তো নিষেধ কোথাও করা নেই, অতএব কেন শূদ্র বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞাদি করতে পারবে না। কিন্তু এখন প্রত্যক্ষশ্রুতি বলছেন- 'ব্রাহ্মণ করবে এগুলো অতএব শূদ্র পারবে না।[১৬] এখানে শ্রবণরূপ প্রত্যক্ষের কথা বলা হয়েছে। অতএব শূদ্রের অধিকার নাই।

কামশ্রুতি অনুসারে শূদ্রেরও যে বেদাধ্যয়ন প্রাপ্ত হবে তা ঠিক নয়, কারণ সেবিষয়ে সামান্যভাবে স্বাধ্যায়বিধি বলে বিশেষার্থ বুঝিয়ে থাকে। ফলে সেখানে স্বাধ্যায় বিধির দ্বারা ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকেরই বেদাধ্যয়ন প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শূদ্রের বিধানটা আকাঙ্ক্ষিত নয়। এবিষয়ে প্রখ্যাত মীমাংসক ভূতনাথ সপ্ততীর্থ মহাশয় তৎকর্তৃক সম্পাদিত মীমাংসাদর্শনগ্রন্থে এই সূত্রের ব্যাখাতে বলেছেন- 'কামশ্রুতি বলে যে সামান্যতঃ প্রাপ্তি হয় তাহা স্বাধ্যায়বিধি বলে বিশেষ ব্যবস্থাপিত হয় বলিয়া গোদোহনপাদ কাম্য স্থলে অপ্ প্রণয়নের জন্য চমসের বদলে প্রযোজ্য হইলেও তদ্ দ্বারা যেমন নিত্য-অপ্ প্রণয়নও সিদ্ধ হয়ে যায়, তাহাতে আর স্বতন্ত্র চমস অপেক্ষিত হয় না, সেইরূপ এস্থলেও স্বাধ্যায় বিধির দ্বারা ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকেরই বেদাধ্যয়ন প্রাপ্ত হয় বলিয়া চতুর্থ বর্ণের যে বেদাধ্যয়ন তাহা ঐ চমসের ন্যায় বিধ্যনাকাঙ্ক্ষিত বলিয়া অবৈধ। আর কামশ্রুতি অনুসারে অর্থাপত্তি বলে অধ্যয়ন প্রাপ্ত হয়, আর তাহা আনুমানিক বিধিবোধিত। কিন্তু স্বাধ্যায়বিধি প্রত্যক্ষগঠিত'।

অতএব আনুমানিকবিধির প্রত্যক্ষবিধির দ্বারা পরিত্যাগ হয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কামশ্রুতিটি বিদ্যার প্রযোজক নয়। বিদ্যা বিনা কিন্তু যজ্ঞ সম্পাদন করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ অন্যভাবে সেখানে সম্ভব হয় না বলে বেদবিদ্বান্ প্রয়োজন হয়। বেদবিদ্বান্ ত্রৈবর্ণিকেরই যজ্ঞকর্মে উৎপত্তি হয়। ফলে এখানে অর্থাপত্তিও বলা যাবে না। সুতরাং অর্থাপত্তি বলে শূদ্রের বেদাধ্যয়ন প্রাপ্ত হবে তা বলা ঠিক নয়। ফলে শূদ্রের বেদাধ্যয়ন অবৈধ। আবার স্মৃতিশাস্ত্রে শূদ্রের বেদাধ্যয়ন কণ্ঠতই নিষিদ্ধ হয়েছে।

তাই বলা হয়েছে- 'স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা'। সুতরাং 'অবৈদ্যত্বাদভাবঃ কর্মণি স্যাৎ'- এই যে মীমাংসাসূত্র বিদ্যমান তার দ্বারা 'বেদবিদ্যাহীন শূদ্রের যজ্ঞাদি কর্মে অধিকার নাই'।

➢ অতএব সর্বশেষ সূক্ত অর্থাৎ মীমাংসা দর্শণের 'অপশূদ্রাধিকরণম্' এর শেষতম সূক্তে বলা হয়েছে-

'তথা চান্যার্থদর্শনম্'।।৩৮।।

শূদ্রের ব্যপারে অন্যার্থদর্শনও আছে। শূদ্রের কোন অধ্যায়ন নেই। অতএব 'কিং লিঙ্গং ভবতি'?- সেখানে হেতুটা কি? শূদ্রের যে অধ্যয়ন নাই- সে বিষয়ে হেতুটা কি? এখানে বোধক কে? 'যদ্যু বা এতৎ শ্মশান যচ্ছূদ্রঃ'। শূদ্র হচ্ছে শ্মশান, অতএব শূদ্রের কাছে কোনও প্রকার অধ্যায়ন করবে না। তাই বলা হয়েছে- 'তস্মাচ্ছূদ্রসমীপে নাধ্যেয়ম্'। অতএব বলা যেতে পারে শূদ্ররা বেদ অধ্যয়ন করতে পারবে না। অতএব অনধ্যয়ন অর্থাৎ অধ্যয়নহীনতা শূদ্রের পক্ষেই বলা হচ্ছে। অতএব অপশূদ্র ব্রাহ্মণাদি (ত্রৈবর্ণিক) যা তাদেরই একমাত্র অধিকার; শূদ্রের অধিকার নেই।

আহবনীয় অগ্নি ছাড়াও বচনের প্রামাণ্যহেতু যাগ হবে। এবং শূদ্রের জন্য যাগ বিধান করা হয়েছে। আহবনীয় ছাড়াই বিধান করা হয়েছে। যেহেতু যাগ হচ্ছে স্বর্গফলক এবং তাছাড়াও যাগ স্বর্গরূপ ফলোৎপাদকও বটে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে- যাগের সদ্ভাবটা স্বর্গকামের নিমিত্ত বলা হয় নি। অতএব যারা স্বর্গকাম করবে তাঁরা যাগ করবেন এমন নয়। যাগসদ্ভাব স্বর্গকামের জন্য নয়, কিন্তু স্বর্গফলতাবিশিষ্টস্য যাগস্য। অর্থাৎ বিশিষ্ট যাগ

হচ্ছে স্বর্গফলতা। অতএব স্বর্গফল হচ্ছে যাগের এবং যাগের ফল হচ্ছে স্বর্গ। অতএব শূদ্রের অগ্নিহোত্রাদি সম্ভব নয়। তাই বলা হয়েছে- 'তস্মাদসম্ভবঃ শূদ্রস্যাগ্নিহোত্রাদিষু'। এই সূত্রে আলোচনা করা হচ্ছে যে বেদে শূদ্রের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ কিনা? তার উত্তরে ভাষ্যে বলা হয়েছে- 'যদ্যু বা এৎশ্মশানং যচ্ছূদ্রঃ। তস্মাচ্ছূদ্রসমীপে নাধ্যেয়ম'। এবং এই শ্রুতিবাক্যে শূদ্রকে শ্মশানতুল্য বলা হয়েছে এবং তার কাছে অপরের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ'। এবং এই কথাটি থেকে আমরা এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, যার অধ্যায়ন নিষিদ্ধ, তার স্বয়ং অধ্যয়ন সুদূর পরাহত। এবং একইরকম ব্যাখা বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৩৮ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলেছেন-

'যস্য হি সমীপেহপি নাধ্যেতব্যং ভবতি স কথম্ অশ্রুতম্ অধীয়ীত'।

বেদের অধ্যায়ন স্বয়ং সম্ভব নয়। গুরুসমীপে গমনপূর্বক এবং গুরুর উচ্চারণ শ্রবণপূর্বক সম্ভব নয়। অপশূদ্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরই অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে অধিকার আছে কিন্তু শূদ্রের কোনও অধিকার নেই। এছাড়াও শূদ্র শ্মশানতুল্য, ফলে তার কাছে অধ্যায়ন নিষিদ্ধ। যেহেতু শ্মশান অপবিত্র। যজ্ঞাদিকর্ম অগ্নিসাধ্য এবং শূদ্রের অগ্নিবিধান নেই। ফলে যজ্ঞাদিকর্মে শূদ্রের কোন অধিকার নেই। 'য এবম্ বিদ্বান্ অগ্নিম্ আধত্তে'- এই মন্ত্রের দ্বারা সামান্যভাবে অগ্নির বিধান করা হয়েছে। তাই বলা যেতে পারে বসন্তাদি কালে ব্রাহ্মণাদির উল্লেখ নিমিত্তরূপে হওয়ায় শূদ্রের অগ্নি বৈধ হয়েছে। কারন এই বাক্যটি অগ্ন্যাধানের স্তাবক হয়। এবং বসন্তাদি বাক্য হল বিধিস্বরূপ।[১৭]

❖ এছাড়াও মহর্ষি বাদরায়ণ কর্তৃক 'ব্রহ্মসূত্র' এর তৃতীয় অধ্যায়ের নবমতম অধিকরণের শূদ্রের বেদ অধ্যয়নের অধিকার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

'শুগস্যতদনাদরশ্রবণাৎ, তদাদ্রবণাৎ, সূচ্যতেহি।। (১।৩।৩৪)

রৈক্কমুনি জনশ্রুতিকে শোকাভিভূত জানিয়াই শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। কাজেই ইহার দ্বারা শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে বলিয়া বুঝায় না।

অর্থাৎ রাজা জনশ্রুতির শোক উৎপন্ন হয়েছে অবজ্ঞাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া হংসরূপী ঋষির নিকট এই উপস্থিতির জন্য রৈক্কের নিকট শোকাভিভূত হইয়া সেই শোক হেতু রৈক্ক জনশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন ইহার কারণ শোক-কে এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে (রৈক্ককর্তৃক- যিনি জনশ্রুতির মানসিক অবস্থা জানিতে পারিয়াছিলেন)।

অতএব একমাত্র দেবতাগণ বেদাধ্যয়নের এবং ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী। এবং উপরিউক্ত সূক্তে আলোচনা করা হচ্ছে যে শূদ্ররাও বেদাধ্যয়ন এবং ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে কি না?- কারণ শূদ্রদেরও দেবতাদের ন্যায় দেহ, শক্তি, ইচ্ছা ইত্যাদি আছে এবং স্বাভাবিকভাবে মনে হয় যে তাহারাও অধিকারী[১৮]। ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় খন্ডের পঞ্চতম শ্লোকে বলা হয়েছে-

'তস্যা হ মুখমুপোদ্ গৃহ্ন্নুবাচাজহারেমাঃ শূদ্রানেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথা
ইতি তে হৈতে রৈক্কপর্ণা নাম মহাবৃষেষু যত্রাস্মা উবাস তস্মৈ হোবাচ।। (৪/২/৫)।।[১৯]

অর্থাৎ রৈক্ক প্রথমে জনশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করে এবং উপায়নসহ ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য প্রার্থনা করলে প্রত্যাখ্যাত হন। কিন্তু তিনি যখন দ্বিতীয় বার রৈক্কের নিকট উপস্থিত হন তখন তিনি জনশ্রুতিকে শূদ্র বলে সম্বোধন করে তাঁহার উপায়ন গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন। সুতরাং এই কাহিনী থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, শূদ্রদেরও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে।

কিন্তু বর্তমানে সূত্রটি এই ধারণাকে খন্ডন করছে এবং জাতি হিসাবে শূদ্রের বেদপাঠের অধিকাররকে অস্বীকার করেছে। কারণ শ্রুতিতে উল্লিখিত 'শূদ্র' শব্দটি জাতিগত শূদ্রকে বুঝায় না, যদিও সাধারণভাবে জাতি হিসাবেই আমরা শূদ্রের অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু আসলে রাজা জনশ্রুতি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। অতএব এখানে শূদ্র শব্দটিকে ব্যুৎপত্তিগত অর্থে গ্রহণ করতে হবে যার অর্থ হল- 'তিনি শোকে অভিভূত'- অথবা তিনি

শোকগ্রস্ত অবস্থার অব্যবহিত পরেই রৈক্কের নিকট উপস্থিত হলেন। এবং এর পরবর্তী সূত্র থেকে জানা যাবে যে, জনশ্রুতি ক্ষত্রিয়ই ছিলেন।

- ব্রহ্ম-সূত্রের পরবর্তী সূত্রে বলা হয়েছে-

'ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ'।।১।৩।৩৫।।[২০]

যেহেতু জনশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে পরবর্তী কালে জানা যায় এই সূত্র থেকে যে তাঁহার উল্লেখ্য আছে ক্ষত্রিয়বংশীয় চিত্ররথের এক বংশধরের সঙ্গে। এবং ক্ষত্রিয়বংশীয় চিত্ররথের বংশের ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে জনশ্রুতির উল্লেখ থাকায় তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব অবধারিত হয়।

এবং এই একই বিদ্যার অধ্যায়ন প্রসঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজা চৈত্ররথ অভিপ্রতারীর সঙ্গে জনশ্রুতির উল্লেখ্য আছে; সুতরাং ইহা থেকে অনুমান করতে পারি যে, জনশ্রুতিও একজন ক্ষত্রিয়ই ছিলেন, কারণ সাধারণ নিয়মানুসারে একমাত্র সমজাতীয় ব্যক্তিদেরই একসঙ্গে উল্লেখ্য করা হয়।

- ব্রহ্ম-সূত্রের পরবর্তী ৩৬তম সূক্তে বলা হয়েছে-

'সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ'।।১।৩।৩৬।।

অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কার ক্রিয়ার উল্লেখ্য থাকয় দ্বিজাতির ক্ষেত্রে এবং এই ক্রিয়াদির অভাবের কথাও বলা আছে শূদ্রদের পক্ষে। এবং দ্বিজাতির ক্ষেত্রে সংস্কারের উল্লেখ্য আছে এবং শূদ্রের পক্ষে এই ক্রিয়াদির নিষেধ আছে বলে শূদ্রদের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার নাই।

উপনয়নাদি সংস্কার ক্রিয়া যে কোন জ্ঞান বা বিদ্যা অর্জনের জন্যই আবশ্যিক প্রয়োজন বলে শাস্ত্রে উল্লেখ্য আছে; কিন্তু এই সকল বিধান শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের লোকের জন্যই বিহিত। শূদ্রদের ক্ষেত্রে এই সকল সংস্কার প্রযোজ্য নয়- এইরূপ কথা শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ

উল্লেখ্য আছে। ‘‘শূদ্র নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করিলেও পাপ হয় না এবং তাহার কোন সংস্কারবিধিও নাই’’। অতএব শূদ্রের বেদাধ্যয়নের অধিকার নেই।

- পুনরায় ‘ব্রহ্মসূত্র’ এর ৩৭তম সূক্তে বলা হয়েছে-

‘তদভাবনির্ধারণে চ প্রবত্তেঃ’।।১।৩।৩৭।।[২১]

সেই শূদ্রত্বের অভাব নির্ধারণ করতে পারে এবং কর্মের প্রেরণা হত। এবং যেহেতু এই কর্মে প্রবৃত্তি গৌতম ঋষির দ্বারা সত্যকামকে উপদেশ দান দৃষ্ট হয় একমাত্র শূদ্রত্বের অভাব জানার পরই সত্যকাম জাবালের ক্ষেত্রে। এবং জাবাল সত্যকাম শূদ্রজাতীয় নয়, গৌতম ঋষি তা অবগত হইয়া তাঁহার উপনয়ন সংস্কার করেছেন।
অতএব শূদ্রগণ যে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী নয় তা এই বিষয় থেকে জানা যায় যে, গৌতমের ন্যায় বিখ্যাত আচার্যগণ ব্রহ্মবিদ্যাদানের পূর্বে নিশ্চিত হতেন যে জাবাল সত্যকামের ন্যায় বিদ্যার্থী শূদ্র না হয়। তাই ছান্দোগ্য উপনিষদ চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ খন্ডে বলা হয়েছে-

> ‘‘তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি তমুপনীয় কৃশানামবলানাং চতুঃশতা গা নিরাকৃত্যোবাচেমাঃ সোম্যানুসংব্রজেতি তা অভিপ্রস্থাপয়ন্নুবাচ নাসহস্রেণাবর্তেয়েতি স হ বর্ষগণং প্রোবাস তা যদি সহস্রং সম্পেদুঃ’’ ।।৪।৪।৫।।[২২]

অর্থাৎ গৌতম সত্যকামকে বললেন, ‘অব্রাহ্মণ কখনও এরকম বলতে পার না। তুমি সমিধ কাষ্ঠ আন। আমি তোমাকে উপনীত করব (অর্থাৎ তোমার উপনয়ন হব); তুমি সত্য হতে বিচলিত হও না’। তার উপনয়নের পর তিনি চার শত দুর্বল ও কৃশ গরু পৃথক করে নিয়ে বললেন- ‘হে সৌম্য, ইহাদের নিয়া যাও’। গরু নিয়া যাইবার সময় সত্যকাম বলিল- ‘সহস্র পূর্ণ না হইলে আমি ফিরিব না’। এইরূপে সে বহু বৎসর অন্যত্র বাস করিল। গরুর সংখ্যা যখন এক সহস্র হল।

- পুনরায় 'ব্রহ্মসূত্র' এর ৩৮ সংখ্যক সূত্রে বলা হয়েছে-

"শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ"।।১।৩।৩৮।।[২৩]

যেহেতু স্মৃতিশাস্ত্রে শূদ্রদের বেদ শ্রবণ, বেদপাঠ, বেদার্থজ্ঞান এবং বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্পর্কে নিষেধ আছে- সেইজন্য শূদ্রদের ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নয়। অর্থাৎ যেহেতু স্মৃতি শাস্ত্রেও শূদ্রদের বেদের শ্রবণ, অধ্যয়ন এবং তদর্থজ্ঞান নিষিদ্ধ, সেইজন্য শূদ্রদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভেরও অধিকার নাই।

অতএব সর্বশেষে বলতে পারি 'ব্রহ্মসূত্র' এর ৩৪ থেকে ৩৮ সংখ্যক সূত্রগুলিতে বেদাধ্যয়নের দ্বারা শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অযোগ্যতার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু শূদ্রের পক্ষে পুরাণ এবং (রামায়ণ, মহাভারতের ন্যায়) মহাকাব্যের মাধ্যমে সেই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

- এছাড়াও 'বেদান্তদর্শনম্'- এর প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৩৪-৩৮ তম সংখ্যক সূক্তে ব্রহ্মসূত্রের অনুরূপ 'অপশূদ্রাধিকরণম্' আলোচিত হয়েছে।

স্বরাদিসহ বৈধ বেদপাঠে শূদ্রের অনধিকার, কিন্তু পুরণাদি পাঠপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার রয়েছে। পূর্বাধিকরণে "তদ্ যো যো দেবানাম্" (বৃঃ ১.৪.১০) ইত্যাদি শ্রুতিবচনে যেমন ব্রহ্মবিদ্যাতে কেবল মানুষেরই অধিকার নিরাকৃত হয়ে অত্রৈবর্ণিক দেবগণেরও অধিকার স্থাপিত হয়েছে; সেইরূপ প্রস্তাবিত অধিকরণে "হারেত্বা শূদ্র" (ছাঃ ৪.২.৩) ইত্যাদি শ্রুতিতে সম্বগবিদ্যাতে অধিকারী জনশ্রুতিতে শূদ্রশব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যাতে কেবল দ্বিজাতিরই অধিকার স্বীকার না করে অত্রৈবর্ণিক শূদ্রেরও অধিকার স্বীকার করতে হবে।

তাই বলা যায় পূর্ব্বাধিকরণে দেবাদির অধিকার কথনের দ্বারা যেমন মন্ত্রপ্রভৃতির দেববিগ্রহাদিরূপ প্রদর্শনকরতঃ বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মরূপ ভূত অর্থে সমন্বয় প্রদর্শিত হয়েছে; প্রস্তাবিত অধিকরণেও সেইরূপ শূদ্র শব্দের ক্ষত্রিয়ের সমন্বয় প্রদর্শনের দ্বারা

শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যার ত্রৈবর্ণিকের সমন্বয় প্রদর্শিত হয়েছে বলে এই অধিকরণের সমন্বয়াধ্যায় সঙ্গতি সিদ্ধ হয়েছে। সেই হেতু 'ন্যায়মালা'-য় বলা হয়েছে-

শূদ্রোহধিক্রিয়তে বে দ বি দ্যা য়া ম থ বা ন হি।
অত্রৈবর্ণিকদেবাদ্যা ইব শূ দ্রো হ ধি কা র বা ন্।।
দেবাঃ স্বয়ংভাতবেদাঃ শূদ্রো হ ধ্য য় ন বর্জ্জনাৎ।
নাধিকারী শ্রুতৌ স্মার্ত্তে ত্বধিকারো ন বার্য্যতে।।[২৪]

শ্রৌতব্রহ্মবিদ্যা এখানে আলোচ্য বিষয়। ছান্দোগ্য সম্বর্গবিদ্যাতে 'ওহে শূদ্র, হার প্রভৃতি', ইত্যাদি বাক্যে বেদবিহিত ব্রহ্মবিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার প্রতীত হয়েছে। আবার শূদ্রের যজ্ঞে অনধিকারী ইত্যাদি বাক্যে তাহার কর্ম্মে অধীকারহীনতা প্রতীত হবে। এবং সেইরূপ ন্যায় অনুসারে বিদ্যাতেও শূদ্রের অধিকার সিদ্ধ হবে না। সেইহেতু শূদ্রের অধিকারের সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনাবশতঃ সংশয় হয় যে- বেদে বিহিত বিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার আছে কিনা?

পূর্ব্বপক্ষের মত অনুসারে অত্রৈবর্ণিক ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের বহির্ভূত দেবতা প্রভৃতির ন্যায় শূদ্র ও বেদে বিহিত বিদ্যাতে অধিকারী। দেবতা ও শূদ্রের মধ্যে বৈষম্য আছে। উপনয়ন ও বেদাধ্যয়ন না থাকলে পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতির বলে দেবগণের নিকট বেদ স্বয়ংপ্রতিভাত। সেইপ্রকারে সুকৃতিরহিত হওয়ায় শূদ্র কিন্তু স্বয়ংপ্রতিভাতবেদ নয়। এবং শূদ্রের উপনয়ন না থাকায় বেদাধ্যয়নবর্জ্জিত হওয়ায় শূদ্রের শ্রুতিতে অধিকারী নেই। সেইহেতু অধিকারের প্রতি হেতু যে বিদ্বতা, তার অভাববশতঃ শ্রৌতবিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার নেই।

পুনরায় পূর্বপক্ষ বলেছেন- ব্রহ্মবিদ্যাতে দ্বিজাতির ন্যায় শূদ্রজাতিরও অধিকার সমান। তাই বলা যেতে পারে শূদ্রজাতির স্বরূপ, গুণকর্মগত জাতিভেদেই শাস্ত্রসম্মত। তারি পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যাদের অধিকার নিরূপণের জন্য এই অধিকরণ আবদ্ধ হয়েছে, সেই শূদ্র জাতির স্বরূপ কি? ১) শূদ্র জাতির স্বরূপ প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেন- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এরাই আর্য, সেই আর্য্যগণ কর্তৃক বিজিত অনার্য্যগণই শূদ্র। ২) পুনরায় অপরপক্ষ বলেন- শূদ্র আর্য্যজাতি, তবে সৃষ্টিকর্ত্তার পদ থেকে তার উৎপত্তি। ৩)

পুনশ্চ অন্যপক্ষ বলেন- ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে যারা বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করে কিন্তু পরসেবাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন তাঁরা হলেন শূদ্র।[২৫]

প্রথম পক্ষ পাশ্চাত্যগণের মতবাদ, ইহার কোন সমর্থন শাস্ত্র হতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে বহু আর্য্যেতর জাতি কাল ক্রমে আর্য্যসমাজে প্রবিষ্ট হয়ে চতুর্থ বিভক্ত উক্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্থানলাভ করেন, ইহা ঐতিহাসিকগণ বলেন।

পুনরায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের বোধক শাস্ত্রবাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, সেই প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেন- সৃষ্টিকর্ত্তার পদ থেকে শূদ্রজাতির উৎপত্তি, তাদের মতে জাতি জন্মগত, কারন নবকল্পারম্ভে সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে সৃষ্টিকর্ত্তার তত্তৎ অবয়ব হতে পৃথক্ পৃথগভাবে ব্রাহ্মণাদি শূদ্রান্ত জাতি চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে-

> ‘তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা সূকরযোনিং বা চন্ডালযোনিং বা ।। (ছা. ৫।১০।৭)

অর্থাৎ পূর্বজন্মে এই পৃথিবীতে শোভনকর্ম করিয়াছিল, তারা শীঘ্রই ব্রাহ্মণযোনি, ক্ষত্রিয়যোনি বা বৈশ্যযোনিতে জন্মলাভ করে। আর যারা এই পৃথিবীতে কুৎসিত কর্ম করেছিল, তারা শীঘ্রই জন্ম হয় কুকুরযোনি, শূকরযোনি বা চন্ডালযোনিতে।[২৬]

তাই বলা যেতে পারে পূর্বকৃত পুণ্য ও পাপ কারন হলে তজ্জন্মে অনুষ্ঠিত বিভিন্নপ্রকার কর্ম এবং গুণ সেই জাতিপ্রাপ্তির কারন নয়।

পুনরায় আবার অপরপক্ষ বলেন- আদিতে সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ, তজন্মে অনুষ্ঠিত বিভিন্নপ্রকার কর্ম এবং সেই কর্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত বিভিন্ন প্রকার গুণবশতঃ সেই ব্রাহ্মণগণই সেইকালে প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে কালক্রমে শূদ্রান্ত জাতি চতুষ্টয়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এদের বলা হয়- ‘গুণকর্মগত জাতিবাদী’ এবং প্রথমোক্তগণকে বলা হয়- ‘জন্মগত জাতিবাদী’। এই গুণকর্মগত জাতিবাদ ও জন্মগত জাতিবাদ এদের মধ্যে কোন

পক্ষ শ্রুতি ও স্মৃতি সম্মত, তা নিরূপণ করতে হবে। জন্মগত জাতিবাদ প্রতিপাদক শ্রুতি বাক্যটি হল যে-

১)" ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজনস্য কৃতঃ।
ঊরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত"।।(তৈঃ আঃ ৩।১২।১৩; ঋক্ সং. ১০।৯০।১২)

পুজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য কৃত ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রটির অর্থ হল- বিরাট্ পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় থেকে ক্ষত্রিয়, ঊরুদ্বয় থেকে বৈশ্য এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হয়েছে।

২) অপর শ্রুতিবাক্য এই যে-

"প্রজাপতিঃ অকাময়ত প্রজায়েয়, সঃ মুখতঃ...নিরমিমীত...ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাম্"। "উরসো বাহুভ্যাং...নিরমিমীত...রাজন্যো মনুষ্যাণাম্"। "মধ্যতঃ...নিরমিমীত...বৈশ্যো মনুষ্যাণাম্"। "পত্তঃ...নিরমিমীত...শূদ্রো মনুষ্যাণাম্"। (তৈঃ সং ৭।১।১।৪-৬)

এইরূপ জন্মগত জাতি প্রতিপাদনে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের একবাক্য সিদ্ধ হয়েছে। এই বিষয়ে স্মৃতিবাক্য হল-

"ব্রাহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টো ব্রহ্মণ রাজসত্তম।
বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্টঃ ঊরুভ্যাং বৈশ্য এব চ।।
বর্ণানাং পরিচর্য্যার্থং ত্রয়াণাং ভরতর্ষভ।
বর্ণশ্চতুর্থঃ সম্ভূতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো বিনির্ম্মতঃ।। (মহাভাঃ শাঃ ৭২।৪-৫)

পুনরায় গুণকর্মগত জাতিবাদের প্রতিপাদক শ্রুতিস্মৃতিবাক্যটি হল-

১) ঋগ্বেদের ঐতরিয়োপনিষদে মনুষ্যসৃষ্টি মাত্র বর্ণিত হয়েছে। যথা-"তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ", "সঃ এতম্ এব সীমানং বিদার্য্য এতয়া দ্বারা প্রাপদ্যতে" (ঐতঃ ১.২.৩, ১.৩.১২)।

২) শুক্লযজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদে পঠিত হয়েছে- "ব্রহ্ম বৈ ইদমগ্র আসীৎ একম্ এব, তদেকং সন্ন ব্যভবৎ, সঃ শৌদ্রং বর্ণম্ অসৃজৎ"।[২৭] (বৃঃ ১.৪.১১-১৩) অর্থাৎ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য ও আনন্দগিরিকৃত টীকানুযায়ী এই ব্রাহ্মণবাক্য সকলের অর্থ এই– অগ্রে ক্ষত্রিয়াদির উৎপত্তি পূর্বে একমাত্র ব্রহ্মরূপেই ব্রাহ্মণ জাতি বর্তমান ছিল, ক্ষত্রিয়াদিভেদে ছিল না। ব্রাহ্মণ জাত্যভিমানী প্রজাপতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রশস্তরূপ ক্ষত্রিয়জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আবার ব্রাহ্মণ অভিমানসম্পন্ন সেই পুরুষ, বিত্ত উপার্জ্জনকারীর অভাবে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ না হয়ে, তিনি বৈশ্য জাতিকে সৃষ্টি করলেন। পুনশ্চ সেই ব্রাহ্মণ জাত্যভিমানী প্রজাপতি, পরিচারকের অভাববশত কর্তব্য কর্ম করতে সমর্থ না হয়ে, তিনি শূদ্র বর্ণকে সৃষ্টি করলেন।

৩) কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে-

> "ব্রহ্ম দেবানজনয়ৎ, ব্রহ্ম বিশ্বমিদং জগৎ। ব্রহ্মণঃ ক্ষত্রং নির্ম্মিতং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণমাত্মনা"।। (তৈঃ ব্রাঃ ২.৮.৮.৯)

অর্থাৎ ব্রহ্ম ইন্দ্রাদি দেবগণকে উৎপাদন করিয়াছেন, ব্রহ্ম এই সমগ্র জগৎকে উৎপাদন করেছেন, ব্রহ্ম থেকে ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হয়, ব্রহ্ম নিজেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই পাঠক্রমানুসারে প্রথমে ক্ষত্রিয় ও পরে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে।

বৃহদারণ্যক এবং তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে পঠিত মন্ত্রবাক্য এই সকলের একবাক্যতালব্ধ অর্থ হয় এইপ্রকার- 'পূর্বে মনুষ্য সৃষ্ট হয়েছে, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং সেই মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করেছেন, সেই মনুষ্যকে বলা হয় ব্রাহ্মণ, কারণ ব্রহ্মা নিজেই ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করেছেন। কালক্রমে সেই ব্রাহ্মণজাত্যভিমানী ব্রহ্ম সন্তানসন্ততি পরম্পরাক্রমে বৃহদারণ্যকে বর্ণিত প্রকারে কর্ম্মানুষ্ঠানের সুকরতার জন্য সেইপ্রকারে কর্ম্মানুষ্ঠানকারী চারটি বর্ণ বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। অতএব ব্রাহ্মণজাতির যে অভিমান তা শরীরধারী পুরুষের পক্ষেই সম্ভব এবং শরীরধারী পুরুষকে সন্তানসন্ততি পরম্পরাক্রমেই বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হবে, এছারা অন্যকোন উপায় নেই। তাই মহাভারতের শান্তি পর্বে বলা হয়েছে-

"ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্।।
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনা প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।।
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ।।
হিংসানৃতপ্রিয়ালুব্ধা সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।।
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।। (মহাভাঃ শাঃ ১৮৮।১০-১৪)

কিন্তু শ্রুতিতে গুণের উল্লেখ্য স্পষ্টভাবে না থাকলেও স্মৃতিতে তা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। শূদ্রত্ব প্রাপ্তির হেতুরূপ বেদাধ্যয়নের পরিত্যাগও শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, যথা- "যোহনধীতা দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ" (মনু সং ২।১৬৮; বাশিষ্ঠ সং ৩য় অঃ)। "ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ" (মহাভাঃ শাঃ ১৮৯।৭)। "বেদসন্ন্যাসতঃ শূদ্রস্তস্মাৎ বেদং ন সন্ন্যসেৎ" (বাশিষ্ঠ সং ১২)। অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিক সমাজের এক বিশাল অংশ কেন বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করে শূদ্রত্ব বরণ করেছিলেন তা সত্যিই চিন্তার বিষয়। মনে করা হয় যে- সুপ্রাচীনকালে কথ্য ভাষা ও বেদের ভাষা ছিল অভিন্ন, "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা"। (গীতা ৩.১০), "কর্ম্মণাঞ্চ প্রর্বত্তনম বেদশব্দেভ্যঃ এবাদৌ নির্ম্মিমীতে সঃ ঈশ্বরঃ" (মহাভাঃ শাঃ ২৩১.৫৭) ইত্যাদি বাক্য থেকে এইপ্রকার পরিস্থিতি প্রতিভাত হয়, কারন শিক্ষক ও শিক্ষ্যেয়ের ভাষা অভিন্ন হলেও যাগযজ্ঞাদির কর্ম্মের প্রবর্ত্তন সম্ভব। কালক্রমে বেদের ভাষা হতে কথ্যভাষার প্রভেদ। ফলে ভাষাজ্ঞানের অভাবে বেদাধ্যয়ন করিতে অসমর্থ হয়ে বহু ব্যক্তি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, ইহা অনায়াসেই অনুমান করা চলে। ইহার সমর্থনও ইতিহাস হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা-

> "ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী। বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্ব্বং লোভাত্ত্বজ্ঞানতাং গতাঃ"। (মহাভাঃ শাঃ ১৮৮.১৫)।

এই চারটি বর্ণ যাহাদের জন্য ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূর্ব্বে বেদময়ী সংস্কৃতভাষা বিহিত হয়েছে। লোভবশত অন্যান্য কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে বহু ব্যক্তি অজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়েছে। সাধারণত বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বলেন- 'বর্তমানকালেও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্য অতি আবশ্যকীয় ইংরেজী ভাষাকে যথোচিত স্থান প্রদান করে সংস্কৃত ভাষাকে অবশ্য শিক্ষণীয় রাষ্ট্র ভাষারূপে গ্রহণ করলে নানাভাবে বহুধা বিচ্ছিন্ন এই হিন্দুনামধেয় আর্যজাতি অতিশীঘ্রই একতাবদ্ধ এক বলবান্ ভারতীয় জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করবে'।

বেদান্তদর্শনের ৩৪-তম সূক্তে বলা হয়েছে-

"শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি" (১।৩।৩৪)

অর্থাৎ জাতিস্বীকৃতি জন্মগত হয়ে পড়ার পরেও এবং সংকরজাতি স্বীকৃতির পরেও কিন্তু কোন না কোন প্রকারে জাতি পরিবর্ত্তন সমাজে প্রচলিত ছিল ইত্যাদি বচন যাজ্ঞবল্ক্য বচন থেকে অবগত হওয়া যায়। সেই প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলা হয়েছে- "জাত্যুৎকর্ষো যুগে জ্ঞেয়ঃ"। তৎকালীন সমাজে এইপ্রকার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বনকারী দ্রোণাচার্য্য ক্ষত্রিয়রূপে এবং শিশুহন্তা ক্রুর অশ্বত্থামা শূদ্ররূপে পরিগণিত না হয়ে ব্রাহ্মণরূপেই পরিগণিত হতেন। কালক্রমে এই ব্যবস্থাও পরিত্যক্ত হয়ে আর্য সমাজে উপনীত হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে অত্রি সংহিতার ৩৬৪ সংখ্যক সূক্তে বলা হয়েছে-

> "দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ। পশুম্লেচ্ছোহপি চণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃত্য"।[২৮]

উক্ত শ্লোকে বর্ণিত দেব ব্রাহ্মণ, চন্ডাল ব্রাহ্মণ ইত্যাদির বর্ণনা অত্রি সংহিতার ৩৬৫ সংখ্যক এবং মহাভারতের শাঃ ৭৬ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। এই শ্লোকটি ইদানীংকালে সকল বর্ণেরই অবস্থার জ্ঞাপক বলে বুঝতে হবে এবং এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে সকল বর্ণেরই অবস্থান সমান। কিন্তু বর্তমানকালীন অবস্থা যে কত সহস্র সহস্র পূর্বে

আরম্ভ হয়েছে তা নিরুপণ করা দুঃসাধ্য। গুণকর্মানুসারে ভগবৎসৃষ্ট মূল বর্ণচতুষ্টয়ের এই প্রকার ক্রমপরিণতি শাস্ত্র আলোচনা থেকেই নির্ণীত হয়েছে।

এইরূপে আমরা দেখলাম যে শতধা বিভক্ত এই হিন্দুজাতি বস্তুতঃ একই আর্য্যজাতি। একই পিতৃপুরুষের শ্রোণিতধারা সকলের ধমনীতেই প্রবাহিত হয়েছে। শূদ্রগণ সৃষ্টিকর্ত্তার পদ থেকে উৎপন্ন নিকৃষ্ট জাতি নয় অথবা শূদ্রগণ ও শূদ্রধর্ম্মা সংকর জাতিগণ অনার্য্য জাতি নয়। ক্ষত্রিয়াদি অন্যান্য বর্ণের ন্যায় ব্রাহ্মণ গণেরই ইহার বংশধর। বেদে গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণ এবং বর্ণানুসারে ধর্ম ব্যবস্থাপিত হওয়ায় সেই সূত্র অবলম্বনে বেদানুসরণকারী আর্য্যগণ নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে কালক্রমে বর্ত্তমান অবস্থাতে উপনীত হয়েছেন এবং বেদত্যাগাদি পূর্ব্বোক্ত হেতুসকলবশত আর্য্যসমাজের এক বিরাট অংশ শূদ্রনামে ও শূদ্রধর্মে নানাবিধ সঙ্করজাতি নামে অভিহিত হয়েছেন।

শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হলে পূর্বপক্ষীরা বলেন যে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে। জনশ্রুতি নামক ক্ষত্রিয়ের, সেই হংসের অনাদরসূচক বাক্য শ্রবণ বশত যে শোক উৎপন্ন হয়েছে তা রৈক্বকর্ত্তৃক স্বীয় সর্ব্বজ্ঞাতাখ্যপনের জন্য 'শূদ্র' এই শব্দের দ্বারা জ্ঞাপিত হয়েছে। শূদ্র শব্দের অর্থ ক্ষত্রিয়ও হয়। যেমন- 'হংসের বাক্য শ্রবণের পর বিদ্যাহীনতাজনিত শোকবশতঃ জনশ্রুতি সেই রৈক্কের নিকট গমন করিয়াছিলেন, এইহেতু জনশ্রুতি শূদ্ররূপে কথিত হয়েছে। অতএব জাতিশূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নেই।

ব্রহ্মবিদ্যাতে মনুষ্যের অধিকার আছে এইপ্রকার ব্যবস্থাকে নিরাকৃত করে দেবতা প্রভৃতিরও বিদ্যাসকলে অধিকার কথিত হয়েছে, বেদবিহিত ব্রহ্মবিদ্যাতে দ্বিজাতির অধিকার আছে এবং নিরাকরণদ্বারা শূদ্ররেও অধিকার আছে।

শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যাতে শূদ্রেরও অধিকার আছে হবে ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল, যেহেতু শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক অর্থিত্ব ও সামর্থ্য সম্ভব এছারাও শূদ্র ব্রহ্মবিদ্যাতে অসমর্থ, এইপ্রকার কোনরকম নিষেধ শ্রুতিতে পঠিত হয় নি। আবার কর্মসকল শূদ্রের অধিকার না থাকার কারণে যে অনগ্নিত্ব হওয়া সত্বেও বিদ্যাসকলে অধিকার নিবর্ত্তক লিঙ্গ প্রমাণ হতে পারে না অতএব শূদ্রের অগ্নিরহিত ব্রহ্মবিদ্যাকে অবগত হইতে পারবে না, একথা বলা যায় না। এবং শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারের সমর্থক শ্রৌতলিঙ্গ প্রমাণ আছে। যেমন

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে- শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন হলেও বিদুর প্রভৃতি বিশিষ্ট বিজ্ঞান সম্পন্নরূপে স্মৃতিতে বর্ণিত হয়েছে।

পুনরায় বেদান্তদর্শণের ৩৫ সংখ্যক সূক্তে বলা হয়েছে-

"ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ"।। (১।৩।৩৫)[২৯]

অর্থাৎ চিত্ররথবংশীয় অভিপ্রতারী নামক প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়ের সহিত একত্রে বর্ণারূপ লিঙ্গপ্রমাণ বর্ত্তমান আছে। এইপ্রকারে অভিপ্রতারীর ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হলে একই বিদ্যাতে শূদ্রের সহিত একত্রে বর্ণনারূপ লিঙ্গপ্রমাণবশতঃ জনশ্রুতিরও ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ সমান জাতীগণের প্রায় একত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব জাতিশূদ্রের শ্রৌত বা ব্রহ্মবিদ্যতে অধিকার নেই ইহা সিদ্ধ হয়েছে কিন্তু শূদ্র শব্দটি যৌগিক অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে।

পুনশ্চ বেদান্তদর্শনের ৩৬ সংখ্যক সূক্তে বলা হয়েছে-

"সংস্কারপরামর্শাত্তদভাবাভিলাপাচ্চ।। (১।৩।৩৬)[৩০]

অর্থাৎ শূদ্রের শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যাতে অনধিকারের প্রতি অন্য লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করছে যেহেতু বলা হয়েছে 'সংস্কারপরামর্শাৎ'। শূদ্রের অভক্ষ্যভক্ষণাদিজন্য কোন পাপ হয় না এবং শূদ্র সংস্কারের যোগ্য নয় ইত্যাদি বচনের দ্বারা উপনয়ন প্রভৃতির অভাব কথিত হয়েছে। সেই হেতু মনুসংহিতায় বলা হয়েছে-

'ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্মেহস্তি ন ধর্মাৎ প্রতিষেধনম্।। (মনু. ১০।১২৬)[৩১]

অর্থাৎ শূদ্রের পক্ষে বিশেষভাবে যা নিষিদ্ধ হয় নি তা করলে শূদ্রের কোন পাপ হয় না; শূদ্রের উপনয়নাদি কোনও সংস্কার নেই; কোনও ধর্মে শূদ্রের নিয়ত অধিকার নেই; এবং পাপকযজ্ঞাদি ধর্মকর্ম করাও তার পক্ষে নিষিদ্ধ নয়।

পুনরায় বেদান্তদর্শনের ৩৭ সংখ্যক সূক্তে বলা হয়েছে-

'তদভাবনির্ধারণেচ প্রবৃত্তেঃ'।। (১।৩।৩৭)

অর্থাৎ জাতিশূদ্রের শ্রৌত বিদ্যাতে অনধিকারের প্রতি অন্য লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করা হচ্ছে অর্থাৎ শূদ্রের অধিকার নেই যেহেতু সত্যবচনের দ্বারা শূদ্রত্বাভাব নির্ধারিত হয়। তাই বলা যেতে পারে শূদ্রের শ্রৌতব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নেই।

পুনরায় বেদান্তদর্শনের 'অপশূদ্রাধিকরণের' শেষ সূত্র অর্থাৎ ৩৮ সংখ্যক সূক্তে বলা হয়েছে-

"শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ"।।(১।৩।৩৮)[৩২]

অর্থাৎ শূদ্রের বিদ্যাতে অনধিকারী হওয়ায় শ্রৌতলিঙ্গপ্রমাণের ন্যায় স্মার্ত্ত লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করছে। কিন্তু স্মৃতিবাক্য থাকায় এবং শিষ্টাচারের হেতুবশত বেদশ্রবণ, বেদাধ্যায়ন, বেদার্থজ্ঞান এবং বেদ প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হওয়ায় শূদ্রের বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নেই।

পুনরায় আবার কেহ কেহ বলেন- 'শ্রাবেয়চ্চতুরোবর্ণান্' ইত্যাদি বাক্যে শূদ্রকে বেদশ্রবণ করার কথা বলা হয়েছে। শূদ্র স্বয়ং ইতিহাসাদি পাঠ করবে না, এই প্রকার কোনরূপ নিষেধ পরিদৃষ্ট হয় না। অতএব শূদ্র ব্রাহ্মণগণের পশ্চাতে উপবেশন করে অনুচ্চারবশত বেদ শ্রবণ করতে পারে এবং স্বরাদিরহিতভাবে বেদ এবং ইতিহাস পুরাণাদি স্বয়ং পাঠ করতে পারে। এইপ্রকার অভিপ্রায় বশত ভগবান ভাষ্যকার বলেছেন-

"শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ ইতি চ ইতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্বর্ণ্যস্য অধিকারস্মরণাৎ"।

সুপ্রাচীনকালে গুণকর্ম্মানুসারে জাতি বর্ণের পরিবর্তন হয়, সেইবিষয়ে প্রমাণ বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্রবাক্য হল-

"এভিস্তু কর্ম্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ।।
সর্ব্বোহয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোহপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি"।। (মহাভাঃ অনুঃ ১৪৩।২৬,৫১)

আবার অন্যত্র বর্ণচতুষ্টয়ের গুণকর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে স্মৃতিতে বলা হয়েছে-

"সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং এপা ঘৃণা। তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র সঃ ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ"।। (মহাভাঃ শাঃ ১৮৯।৪)।

অনন্তর বলা হয়েছে যে শূদ্র যদি সত্যাদি সপ্তপ্রকার কর্মে গুণকর্মে পরিদৃষ্ট হয়, তাহলে শূদ্রকে ব্রাহ্মণরূপে গ্রহণ করতে হবে। তাই বলা হয়েছে-

"শূদে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছুদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো নচ"।। (ঐ ১৮৯।৮)[৩৩]

সুপ্রাচীনকালে কিন্তু বিবাহ ব্যতিরিক্ত স্থলে বর্ণচতুষ্টয়ের ব্যভিচারজাত সন্তান সন্ততি, সগোত্রাদি বিবাহজ সন্তান সন্ততি এবং উপনয়ন সংস্কারের অভাবে বৈধ সন্তানসন্ততি বর্ণসংকর আখ্যায় ভূষিত হয়। তাই মনুসংহিতায় বলা হয়েছে-

"ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ"।। (১০।২৪)।।

কালক্রমে কিন্তু বর্ণচতুষ্টয়ের অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে বিবাহ সন্তানসন্তিও পিতা কিংবা মাতার জাতি প্রাপ্ত না হয়ে বর্ণসংকর পর্য্যায়ভূত হয়ে পড়ে। তাই মনুসংহিতায় বলা হয়েছে-

"সঙ্কীর্ণযোনয়ো যে তু প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ তান্ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ"।। (১০।২৫)[৩৪]

অর্থাৎ উপরি উক্ত শ্লোক দুটি থেকে অনুমাণ করা যেতে পারে যা মানুষের আয়ত্তাতীত ও প্রবৃত্তবশে মানুষ যা প্রায় অনুষ্ঠান করে এইপ্রকার সগোত্রবিবাহ ও ব্যভিচার বিষয় অপেক্ষা যা কারণবশতঃ সমাজবদ্ধ মানুষ সমষ্টিগতভাবে বুদ্ধিপূর্বক অনুষ্ঠান করে চলেছে অহরহ, কিন্তু এই সমস্ত সকল বিষয় পরে সংগঠিত হয়ে থাকে, ইহা সমাজজীবনে দৃষ্টসিদ্ধ।

তাই অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন- 'দলন' বস্তুটি আমাদের দেশে ও সমাজে আবহমান কাল থেকে প্রায় একটি 'Fine Arts' এ পরিনত হয়েছে, যার তুলনা জগৎ এ শুধু দুর্লভ নয়, একেবারে অপ্রাপ্য। মুনি-ঋষিদের দোহায় দিয়ে আর নিত্যকর্ম পদ্ধতিকে ধর্মের শিকলে বেঁধে রাখে, সঙ্গে সঙ্গে শুধু বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ আর জন্মান্তরবাদের মতো ধারণার জোরে ইতিহাসে সর্বকালের সর্বদেশের সবচেয়ে মজবুত 'শ্রেণীকতৃত্ব'-এর ইমারত এদেশের মনুবাদীরা পরম ঐতিহাসিক দক্ষতায় প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন'।

অতীত ভারতে মানুষ কর্তৃক মানুষের এই 'দলন'-প্রক্রিয়া যেহেতু প্রধানত গোষ্ঠীগতভাবে সংগঠিত হয়েছে- সেকারণে 'দলনকারী' ও 'দলিত' সম্পর্কের বিভাজনটিও গোষ্ঠীগত। তাই বলা হয়েছে-

> "চাতুরর্বর্ণস্য কর্ম্মাণি চাতুর্ববর্ণ্যঞ্চ কেবলম্। অসৃজৎ স হি যজ্ঞার্থে পূর্ব্বমেব প্রজাপতিঃ'। (মহাভাঃ অনু ৪৮।৩)[৩]

তথ্যসূত্র

---

১. ড. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, অপশূদ্রাধিকরণম্, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা-৭০০০০৩, প্রথমসংস্করণ ২০০৯, পৃ. ১-২।

২. তদেব, পৃ. ২-৩।

৩. তদেব, পৃ. ৪-৫।

৪. তদেব, পৃ. ৬-৭।

৫. তদেব, পৃ. ৮-৯।

৬. তদেব, পৃ. ১০-১১।

৭. তদেব, পৃ. ১২-১৩।

৮. তদেব, পৃ. ১৪-১৫।

৯. তদেব, পৃ. ১৬-১৭।

১০. তদেব, পৃ. ১৮-১৯।

১১. তদেব, পৃ. ২০-২২।

১২. তদেব, পৃ. ২৩।

১৩. তদেব, পৃ. ২৪-২৫।

১৪. তদেব, পৃ. ২৬-২৭।

১৫. তদেব, পৃ. ২৮-২৯।

১৬. তদেব, পৃ. ৩০-৩১।

১৭. তদেব, পৃ. ৩২-৩৪।

১৮. স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, ব্রহ্মসূত্র, নবম অধিকরণ, রমা আর্ট প্রেস, কলকাতা-৭০০০৩০, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ১২৮।

১৯. অতুল চন্দ্র সেন- সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত উপনিষদ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৭, নতুন সংস্করণ ২০১৩, পৃ. ৫১১।

২০. স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, ব্রহ্মসূত্র, নবম অধিকরণ, রমা আর্ট প্রেস, কলকাতা-৭০০০৩০, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ১২৯।

২১. তদেব, পৃ. ১৩০।

২২. অতুল চন্দ্র সেন- সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, উপনিষদ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৭, নতুন সংস্করণ ২০১৩, পৃ. ৫১৭।

২৩. স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, ব্রহ্মসূত্র, নবম অধিকরণ, রমা আর্ট প্রেস, কলকাতা-৭০০০৩০, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ১৩১।

২৪. স্বামী বিশ্বরূপানন্দ কর্তৃক অনুবাদক ও ব্যাখাত, সংশোধকসম্পাদকৌ স্বামী চিদ্ঘনানন্দ পুরী ও বেদান্তবাগীশ শ্রী আনন্দ ঝা, বেদান্তদর্শনম্, উদ্বোধন কার্যালয়, রমা আর্ট প্রেস, কলকাতা- ৭০০০৩০, ১২ তম পুনর্মুদ্রণ জুলাই ২০১৭, পৃ. ৭৬৪।

২৫. তদেব, পৃ. ৭৬৫।

২৬. অতুল চন্দ্র সেন- সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত,উপনিষদ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৭, নতুন সংস্করণ ২০১৩, পৃ. ৫৫৬।

২৭. স্বামী বিশ্বরূপানন্দ কর্তৃক অনুবাদক ও ব্যাখাত, সংশোধকসম্পাদকৌ স্বামী চিদ্ঘনানন্দ পুরী ও বেদান্তবাগীশ শ্রী আনন্দ ঝা, বেদান্তদর্শনম্, উদ্বোধন কার্যালয়, রমা আর্ট প্রেস, কলকাতা-৭০০০৩০, ১২ তম পুনর্মুদ্রণ জুলাই ২০১৭, পৃ. ৭৬৬।

২৮. তদেব, পৃ. ৭৮০।

২৯. তদেব, পৃ. ৭৮৬।

৩০. তদেব, পৃ. ৭৮৮।

৩১. ড. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী সম্পাদিত, মনুসংহিতা, দশমঅধ্যায়: সমাজনীতিঃ সঙ্করজাতির উৎপত্তি, চারবর্ণের আপৎকালে বৃত্তিবিধান, শ্লোক ১২৬, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-৭০০০০৬, তৃতীয় সংস্করণ স্বাধীনতাদিবস, ১৪১৯, পৃ. ১০৫১।

৩২. স্বামী বিশ্বরূপানন্দ কর্তৃক অনুবাদক ও ব্যাখাত, সংশোধকসম্পাদকৌ স্বামী চিদ্ঘনানন্দ পুরী ও বেদান্তবাগীশ শ্রী আনন্দ ঝা, বেদান্তদর্শনম্, উদ্বোধন কার্যালয়, রমা আর্ট প্রেস, কলকাতা-৭০০০৩০, ১২ তম পুনর্মুদ্রণ জুলাই ২০১৭, পৃ. ৭৯০-৭৯১।

৩৩. তদেব, পৃ. ৭৭৬।

৩৪. ড. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী সম্পাদিত, মনুসংহিতা, *দশমঅধ্যায়:* সমাজনীতিঃ সঙ্করজাতির উৎপত্তি, চারবর্ণের আপৎকালে বৃত্তিবিধান, শ্লোক ২৫, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-৭০০০০৬, তৃতীয় সংস্করণ স্বাধীনতাদিবস, ১৪১৯, পৃ. ১০১৬-১০১৭।

৩৫। করুণাসিন্ধু দাস, পিছড়ে বর্গঃ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের দর্পণে, সুজিত সেন সম্পাদিত, কে. মিত্রগ্রন্থমিত্র, কলিকাতা-০৯, প্রথমসংস্করণএপ্রিল, ২০১৩, পৃ.২৬২।

উপসংহার

উপসংহার

দলিত রাজনীতি ও দলিত আন্দোলনের একটি স্বতন্ত্র ধারা ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বেশ কিছুদিন হল প্রবলভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। দলিত বলতে আমরা সবাই জানি নির্যাতিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, শোষিত, শূদ্র ইত্যাদি বহু পারিভাষিক শব্দ। তবে এই ঐতিহাসিক ধারাপথ একদিনে গড়ে ওঠেনি; প্রাচীনকাল থেকেই এই ধারার সূত্রপাত। নিম্নবর্গীয় মানুষদের উত্থান-পতনমূলক রাজনৈতিক আন্দোলনের সমপর্যায়ী ধারা যুগ যগান্তর ধরে অব্যাহত হয়ে আসছে। সমাজ ও রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতে যারা অবনত ও অবদমিত তাঁদেরকেই এককথায় দলিত অভিধায় চিহ্নত করা হয়। দলিত সমস্যা থেকে সমাধানের এখনও কোনো প্রাগতিক-সহৃদয় সামাজিক-মানবিক পন্থাপন্থির দৃশ্যপট তত্ত্বে ও কার্যে দৃষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। উচ্চকোটির পরশ্রমভোজী শ্রেণী ও জাত নিম্নকোটির পরিশ্রমজীবী মনুষ্যজাতিকে অত্যাচার-অবিচারের নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, পরাধীনতা ও দাসত্বের নিকৃষ্ট প্রকোষ্ঠে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে।

ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে দলিত হল তারাই যাদেরকে ম্লেচ্ছ, চন্ডাল, অন্ত্যজ, অচ্ছ্যুত ইত্যাদি শব্দ দারা চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু মনুস্মৃতি ও ধর্মস্মৃতিতে জাত-পাতযুক্ত ধারণার পাশাপাশি পবিত্র ও অপবিত্রতার প্রশ্নকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জাতিভেদ প্রথার কাঠামোর মধ্যেই শূদ্রদের অবস্থানগত পরিবর্তনের পরিবর্তে জাতপাতের মৌলিক উপাদান নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এর প্রধান কারণ হল যে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের কল্পনার যে স্বর্ণময় যুগ ছিল, দলিতদের কাছে তা অবশ্যয় হয়ে ওঠে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ, যার প্রধান বৈশিষ্ট ছিল জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতা। তাই এই কথা প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যায় ব্রাহ্মণ্যবাদী সন্দর্ভ অনুযায়ী ভারতীয় সমাজ কাঠামোর নিম্নস্তরে থাকা শূদ্রদের কোনো অধিকার নেই, তাই তাদের শুধু দণ্ড দেওয়া হয়।

তাই আমি আমার গবেষণা সন্দর্ভে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, শূদ্ররা তথাকথিত উচ্চত্তর তিনটি বর্ণের ভৃত্য, অস্থাবর সম্পত্তি এবং মাঝে মাঝেই ক্রীতদাসরূপে বর্ণিত হয়েছে। তার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে-

‘শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে’।। (মনুসং. ১০/১২৯)

অর্থাৎ শূদ্র কৃষি প্রভৃতি কাজের দ্বারা ধনসঞ্চয় করতে সমর্থ হলেও তার ধনসঞ্চয় করার কর্তব্য নয়। কারণ রূপে বলা যেতে পারে শূদ্র ধনসঞ্চয় করলে ব্রাহ্মণদেরই প্রত্যবায়গ্রস্ত অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানহীন শূদ্র মহাধনবান্ হলেও ধনমদে মত্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের অবমাননা করতে পারে। তাছাড়াও শূদ্র যদি অতিরিক্ত ধনশালী হয় তাহলে সে ব্রাহ্মণদের খুব বেশি দান করতে থাকবে এবং ব্রাহ্মণগণও সেই দান গ্রহন করতে পারে। অথবা শূদ্ররা ব্রাহ্মণদের পরিচর্যা না করে তাদের পীড়া উৎপাদন করবে, এটাই হল এই শ্লোকের তাৎপর্য।

তাই বলতে পারি অধুনা ভারতীয় সমাজের শ্রেণী ভিত্তিতে যারা দলিত রাজনীতি নিয়ে পর্যালোচনা করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চাকারী মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের মতে, দলিত হল শ্রেণিগত বিচারে কৃষক, কৃষি-শ্রমিক, দিন মজুর, শ্রমিক, ছাত্র এবং অন্যান্য সম পর্যায়ের পেশাগত গোষ্ঠি। ভারতীয় আদমশুমারী অনুযায়ী দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী গোষ্ঠী সচেতন সংঘবদ্ধ একটি অংশ হল দলিত। আমি আমার গবেষণা সন্দর্ভে দলিত কথাটি সংকীর্ণ অর্থেই ব্যবহার করেই বলছি যে ঋগ্বৈদিক যুগে সমাজে জন্মগত ও বর্ণগত পেশা ছিল উন্মুক্ত অর্থাৎ তথাকথিত শূদ্রদের যাগযজ্ঞ ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাধা ছিল না তেমনভাবেই নারীদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণও ছিল চোখে পড়ার মতো। নারীদের বুদ্ধিনিষ্ঠ, নৈতিকতা, আধ্যাতিকতা, ললিতকলাবিষয়ক, যুদ্ধবিদ্যা, শরীরচর্চা প্রভৃতি বহুমুখী শিক্ষা বৈদিক যুগের রমণীগণ লাভ করত। কিন্তু বৈদিকোত্তরযুগ অপেক্ষা বৈদিকযুগেই সর্বতোমুখী স্ত্রীশিক্ষার প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্মসূত্র ও মনুসংহিতার যুগ থেকে নারীদের সমুন্নত প্রতিষ্ঠাভূমি ভাঙ্গতে থাকে। এমনকি শূদ্রদের ন্যায় উচ্চবর্ণের নারীদেরও উপনয়ন ও বেদ পাঠের অধিকার লুপ্ত হয়। শূদ্র ও নারীসমাজের এই ক্রম অবনতির জন্য মূলতঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ সূমহকেই দায়ী করা যায়।

অপশূদ্ররা হচ্ছে সার্বজনীন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বৈদিকযুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এদের কর্মকান্ড সকলকে মুগ্ধ করে, তাই এদেরকে কখনই পতিত ও অস্পৃশ্য অভিধায় অভিহিত করা চলেনা এরাও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সমান অধিকারের দাবী করতেই পারে এবং সর্বসম্মতভাবে এদেরকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা আমাদের সবারই কর্তব্য।

দলিতদের প্রতি ভগৎ সিংহের আহ্বান- "একথা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে সুবিধাভোগী শ্রেণীর ব্যক্তিরা নিজেদের অধিকার ভোগ করার জন্য সংগ্রাম করবে, কিন্তু নীচুতলার মানুষকে দমিয়ে রাখতে তারা সবরকম প্রচেষ্টা চালায়, সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত মানুষ গুলোকে তারা পায়ের তলায় রাখতে চায়। অর্থাৎ, জোর যার মুলুক তার নীতি চালায়। সুতরাং আর সময় নষ্ট না করে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে এক হও এবং এই সমাজ কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করো। তারপর দেখা যাক কারা তোমাদের প্রাপ্য অধিকার অস্বীকার করার সাহস দেখায়। অন্যের অনুকম্পা প্রত্যাশী হয়ে বসে থেকো না, ওদের প্রতি কোন মোহ রেখো না সজাগ থাকো যাতে আধিকারিক বর্গের ফাঁদে না পড়ো, কারন তোমাদের পক্ষপাতি হওয়াতো দূরের কথা ওরা ওদের তালেই তোমাদের নাচাতে চাইবে। প্রকৃত পক্ষে এই পুঁজিবাদী আমলাতান্ত্রিক জোটই তোমাদের দারিদ্র্য ও নিপীড়নের জন্য দায়ি। তাই সর্বদা একে পরিহার কর। এদের কূটকৌশল সম্বন্ধে সজাগ থাকো, এটাই রাস্তা। তোমরাই প্রকৃত শ্রমিক শ্রেণী। শ্রমিকেরা এক হও—শৃঙ্খল ছাড়া তোমাদের কিছু হারানোর নাই। উঠে দাঁড়াও, এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো। গ্র্যাজুয়ালিজম ও রিফর্মিজম তোমাদের কোন কাজে আসবে না। সামাজিক আলোড়নের মাধ্যমে বিপ্লব শুরু কর এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিপ্লবের জন্য কোমর বাঁধো। তোমরা, একমাত্র তোমরাই জাতির স্তম্ভ ও মূলশক্তি। জেগে ওঠো ওহে সুপ্ত সিংহের দল! বিদ্রোহ কর, বিপ্লবের পতাকা উর্দ্ধে তুলে ধর" (জুন ১৯২৮ সালে 'কীর্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত 'অচ্ছুতসমস্যা' প্রবন্ধের অংশ)।

তাই সর্বশেষে বলতে পারি জাত-পাত ভিত্তিক ও স্তরবিন্যস্ত দলিত জনগণ ফিরে পাবে মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস এবং পুষ্ট হবে সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রগতি ও বিকাশ।

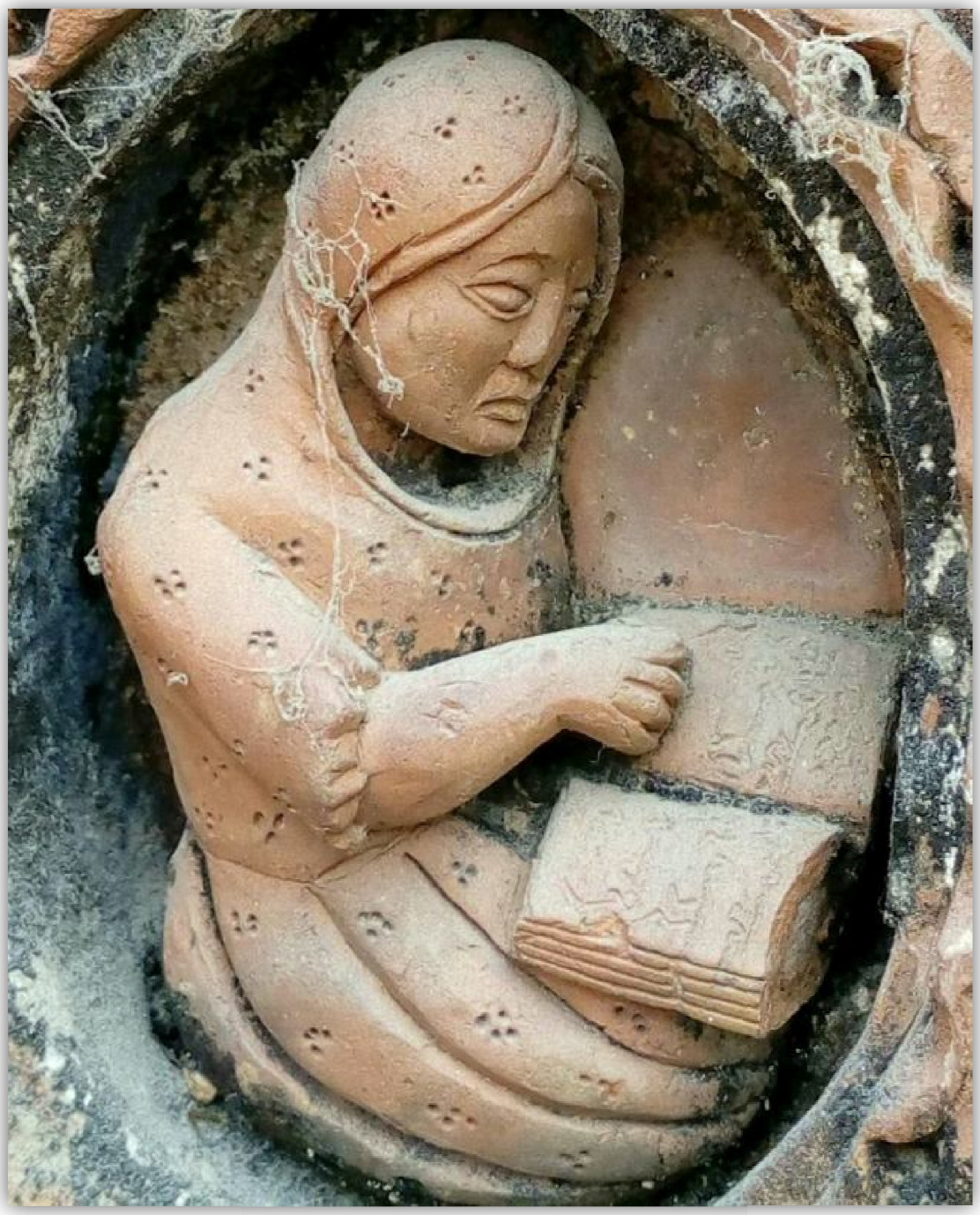

(চিত্র. ৫ প্রাচীন যুগের নারীদের শিক্ষা পদ্ধতির অন্তর্লিখন)

https://bengali.koulal.com/%E0%A6%85%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE/?fbclid=IwAR3ct00gTN0qacPwMjqvl3capSgimvoGRmmzQgsX3jVu1--gLCh_wgL4RWI

উল্লেখপঞ্জী

উল্লেখপঞ্জী

বাংলা গ্রন্থ

- সেন, সুজিত, দলিত আন্দোলন প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ, কলকাতা,গ্রন্থ.মিত্র.কে , ২০১৩।
- ভট্টাচার্য, ড. তপনশঙ্কর, অপশূদ্রাধিকরণম্, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১০।
- সেন, সুজিত, জাতপাত ও জাতি: ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ২০০৩।
- সাহা, ড. বিশ্বরূপ, মীমাংসান্যায়প্রকাশ, কলকাতা, সদেশ, ২০১৩।
- সংক্ষিপ্ত মহাভারত (১ম ও ২য় খন্ড), গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ২০১৫।
- সেন, সুজিত, জাতপাতের রাজনীতি, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯।
- চট্টোপাধ্যায় পার্থ ও সান্যাল হিতেশরঞ্জন, সামাজিক গতিময়তার ইতিহাস, কলকাতা, বুকপোস্ট পাবলিকেশন।
- সিংহ, কঙ্কর, মনুসংহিতা এবং শূদ্র, কলকাতা, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, ২০১৫।
- থাপার, রোমিলা, ইতিহাসের রূপক প্রাচীন ভারত, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ২০১৮।
- পাল, বিপদ্ভঞ্জন, ভারতীয় দর্শন, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০১৪।
- ভট্টাচার্য, সুকুমারী, বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য, কোলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।
- ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৭।
- শর্মা, রামশরণ, প্রাচীন ভারতে শূদ্র, কোলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৩৮৯।

- ভট্টাচার্য্য, সুকুমারী, প্রবন্ধসংগ্রহ ১, কোলকাতা, গা ঙ চিল, ২০১২।
- ভট্টাচার্য্য, সুকুমারী, প্রবন্ধসংগ্রহ ২, কোলকাতা, গা ঙ চিল, ২০১২।
- রায়, দেবেশ, দলিত, কোলকাতা, সাহিত্য আকাদেমি, ২০০৪।
- সেন, সুজিত, জাতপাথ ও সংরক্ষণ ভারতীয় প্রেক্ষাপট, কোলকাতা, গ্রন্থমিত্র, ২০০৮।
- বসু, নির্মল কুমার, হিন্দু সমাজের গড়ন।
- দেবনাথ, ড. আর এম, বৌদ্ধ-হিন্দ-মুসলিম সামাজিক বিবর্তন, ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ১৪২১।
- ভট্টাচার্য্য, সুকুমারী, ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষ্যৎ, কলকাতা, সরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ২০১৫।
- ভট্টাচার্য্য, সুকুমারী, প্রাচীন অপ্রাচীন, কলকাতা, কিশলয় প্রকাশন, ২০০৮।
- শাস্ত্রী, বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. মানবেন্দু, মনুসংহিতা, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১৯।
- রায়, সত্যরঞ্জন, হিন্দুধর্মে হেঁয়ালি (বাবাসাহেবের অনন্য গ্রন্থ '*Riddles in Hinduism*'- এর অনুবাদ), কলকাতা, প্রত্যুষ পাবলিকেশন, ২০১৬।
- ভট্টাচার্য্য, সুকুমারী, প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯৩।
- চট্টোপাধ্যায়, সুনীল, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৩।
- বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী, ব্রহ্মসূত্র, কলকাতা, রমা আর্ট প্রেস, ১৯৯৬।
- সেন অতুল চন্দ্র-তত্ত্বভূষণ সীতানাথ-ঘোষ মহেশচন্দ্র, উপনিষদ, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ২০১৩।
- হাবিব, ইরফান, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪।
- ভট্টাচার্য্য, সুকুমারী, প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৯৪।
- বসু, ড. যোগীরাজ, বেদের পরিচয়, কলকাতা, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫।

- সিনহা, গোপাল চন্দ্র, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ ১৫৫৬, কলকাতা, মিত্রম্ প্রকাশণী, ২০০৯।
- গোয়েন্দকা, জয়দয়াল, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, গোরক্ষপুর, গীতাপ্রেস, ২০১৪।
- বর্মন, রূপ কুমার, জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান, কলকাতা, অ্যালফাবেট বুকস্, ২০১৯।
- হাবিব, ইরফান, ভারতবর্ষের মানুষের ইতিহাস-১ প্রাক-ইতিহাস, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭।
- ভট্টাচার্য, মহুয়া, মহাভারতে নারী, 'এবং ও আমরা', প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারী, ২০০৫।
- বসু, রাজশেখর, প্রবন্ধাবলী, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৫৯।
- সিকদার, সুকুমার সিকদার, মনুসংহিতার শূদ্রভাষ্য, কলকাতা, নির্মল বুক এজেন্সি, ২০০৮।
- স্বামী ভক্তিচারু শ্রীমৎ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, নদীয়া, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, ২০১৩।
- পুরী স্বামী চিদ্ঘনানন্দ- ঝা শ্রীআনন্দ বেদান্তবাগীশ, বেদান্তদর্শনম্ ১, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৭।
- ভট্টাচার্য, সুকুমারী, ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৬০।
- ভট্টাচার্য, দীপক, ভারত ও ভারততত্ত্ব, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২।

ইংরেজী গ্রন্থ

- Eleanor Zelliot, Mulk Raj Anand, *an Anthology of Dalit Literature*, New Delhi, Gyan Publishing.
- Dutta, Dr. Bhupendra Nath, *Studies of Indian Society Polity*.

- Thapar, Romila, *Interpreting Early India*, New Delhi, Oxford University Press, 1992.
- Ambedkar, B.R., *Annihilation of Caste*, New Delhi, Navayana Publishing Pvt Ltd, 1936.

ইন্টারনেট সোর্স (Web Sources)

- https://en.wikipedia.org/wiki/Dalit
- https://www.amarboi.com/
- https://bengali.koulal.com/%E0%A6%85%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE/?fbclid=IwAR3ct00gTN0qacPwMjqvl3capSgimvoGRmmzQgsX3jVu1--gLCh_wgL4RWI
- https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enIN745IN745&tbm=isch&q=vedas+dalit&chips=q:vedas+dalit,online_chips:untouchability,online_chips:caste&usg=AI4_-kQsE8Ojs7AOQRmChingL8VspaCgbA&sa=X&ved=0ahUKEwj51ujYkpbiAhXCdCsKHUicBa4Q4lYILCgC&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=gwDJPEu9DPkMeM:
- https://www.google.com/imgres?imgurl=https://d1u4oo4rb13yy8.cloudfront.net/article/85141-oagzuuyalr-1521723421.jpg&imgrefurl=https://scroll.in/article/872964/my-parents-changed-our-last-name-survey-lays-bare-caste-discrimination-among-south-asians-in-us&docid=WhOolNjpsIKb7M&tbnid=tXk9_YwtdWTM:&vet=1&w=1200&h=630&source=sh/x/im
- https://www.google.com/imgres?imgurl=https://sites.google.com/site/indiazbc/_/rsrc/1430293643978/caste/INDIA%2520caste%25202.png&imgrefurl=https://sites.google.com/site/indiazbc/caste&docid=4VVkxaQHP54fCM&tbnid=aGLDCuv4qjLroM:&vet=1&w=960&h=720&source=sh/x/im
- https://archive.org/
- https://www.google.com/search?q=1000+b.c+indian+map&rlz=1C1CHBD_enIN745IN745&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwignPqz15biAhVLVH0KHc8rCoEQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=W07kU7djru6nkM: